হিন্দু প্রমাবিজ্ঞান বা ন্যায়-সোপান

যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি ব্রহ্মেতি বেদান্তিনো,
বৌদ্ধা বুদ্ধ ইতি প্রমাণপটবঃ কর্ত্তেতি নৈয়ায়িকাঃ।
অর্হন্নিত্যথ জৈন শাসনরতাঃ কর্ম্মেতি মীমাংসকাঃ
সোঽয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলং ত্রৈলোক্যনাথো হরিঃ॥

তর্কবিজ্ঞান, ধর্ম্মযোগ, ইংরেজী ভাষায় গীতার ভূমিকা, গীতা-সোপান,
দর্শন-সোপান ও বেদান্ত-সোপান প্রণেতা

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র ন্যায়বাগীশ বি-এ।

মূল্য ॥৵৹ আনা।

গ্রন্থকারের নিবেদন।

১৯৩৯ সালের শেষভাগে মৎপ্রণীত বেদান্ত-সোপান নামে বেদান্তের ভূমিকাস্বরূপ, একখানা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানার একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহার আলোচনাপ্রণালী অনেকটা পাশ্চাত্য আলোচনাপ্রণালীর অনুযায়ী এবং ইহাতে ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যাকারদিগের মধ্যে, শঙ্কর, রামানুজ, নিম্বার্ক, মাধ্ব এবং বল্লভাচার্য্য প্রভৃতি দার্শনিকদিগের মতের সহিত পাশ্চাত্য অদ্বৈত, দ্বৈত এবং দ্বৈতাদ্বৈত মতসকলের তুলনামূলক সমালোচনা আছে। এই ছাড়া, এই সকল ব্যাখ্যাকারদিগের ব্যাখ্যার মধ্যে কোন্‌টি সূত্রকারের মতানুযায়ী ব্যাখ্যা, এই বিষয়ে বিস্তারিত বিচার এবং সমালোচনাও ইহার আর একটি বিশেষত্ব। গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে, আমার দর্শনানুরাগী বন্ধু-দিগের মধ্যে কেহ কেহ, বিশেষতঃ রামমালা গ্রন্থাগারের সুযোগ্য এবং সুবিজ্ঞ গ্রন্থাগারীক এবং তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত রাসমোহন চক্রবর্ত্তী মহোদয়, বেদান্ত-সোপানের অ্‌নুকরণে ন্যায়ের একখানা ভূমিকা গ্রন্থ লিখিবার অনুরোধ করেন। বয়স তখন ৮১ বৎসরের উপর, স্বাস্থ্য ক্ষুন্ন, স্মৃতি এবং দর্শনশক্তি উভয়ই ক্ষীণ। এই অবস্থায় নূতন কোনও গ্রন্থ রচনায় হাত দিতে সাহস সঞ্চয় করিতে পারি নাই; কিন্তু তাহা বলিয়া বন্ধুদিগের অনুরোধ রক্ষার আকাঙ্ক্ষাও মন হইতে অপসৃত করিতে পারি নাই। এই দুদোল্যমান অবস্থায় কয়েক মাস কাটিয়া যায়। পরে একদিন মনে হইল, জীবনের সায়াহ্নে যেটুকু শক্তি আছে, তাহা দ্বারাই বন্ধুদিগের অনুরোধ রক্ষার চেষ্টায় দোষ কি? ফলস্বরূপ মাস দুই তিন যথাসম্ভব পরিশ্রম এবং যত্নপূর্ব্বক হিন্দু-প্রমাবিজ্ঞান বা ন্যায়-সোপান নামে ন্যায়ের একখানা ভূমিকা-গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করি। পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমার বন্ধু বদান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক এই গ্রন্থখানা ছাপাইবার ভার গ্রহণ করেন। ফলে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতের সঙ্গে সঙ্গেই মুদ্রাঙ্কনের কার্য্যও আরম্ভ হয়। আমি এইজন্য মহেশবাবুর নিকট আমার গভীর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

গ্রন্থখানার নাম দেওয়া হইয়াছে হিন্দু-প্রমাবিজ্ঞান বা ন্যায় সোপান। গ্রন্থারম্ভেই কারণ প্রদর্শনপূর্ব্বক বলা হইয়াছে যে, ন্যায় দর্শনের প্রধান আলোচ্য বিষয়ই প্রমাণ এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়সকল। প্রমাণ বিষয়ে হিন্দু দর্শনসকলের মধ্যে ন্যায়ের স্থান যে সর্ব্বোচ্চে ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত। এইজন্য ন্যায় দর্শনকে প্রমাবিজ্ঞান বলিলেও কথায় ভুল হয় না। প্রকৃতপক্ষে ন্যায় দর্শনের বাহিরে প্রমাণ সম্বন্ধে আলোচনা অতি অল্পই আছে। বৈদান্তিকগণ অর্থাপত্তি এবং অনুপলব্ধিকে এবং পৌরাণিকগণ ঐতিহ্য এবং সম্ভবকে, ন্যায় দর্শনের বাহিরের প্রমাণ বলিয়া মনে করেন। নৈয়ায়িকদিগের মতে ইহারা অনুমান বা প্রত্যক্ষ বা শব্দেরই প্রকারভেদ মাত্র। সে যাহাই হউক, গ্রন্থে এই সকলের স্বরূপ কি, তাহার আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং গ্রন্থের প্রমাবিজ্ঞান সোপান বা ন্যায় সোপান নামের সার্থকতা আছে।

এক সময়ে ন্যায়ের অধ্যাপন এবং অধ্যয়নই ছিল বঙ্গদেশের চতুষ্পাঠী-সকলের বিশেষত্ব। ন্যায়শাস্ত্রকে বলা হয় সর্ব্বশাস্ত্র-প্রদীপ। প্রকৃতপক্ষে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে চিন্তা এবং বিচারশক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য জ্যামিতি এবং ন্যায়শাস্ত্রের তুলনা নাই। এখন নানাকারণে ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনায় চতুষ্পাঠীতে ভাটা পড়িয়াছে। তাহা হইলেও শিক্ষিত লোক-দিগের অনেকেরই ন্যায়ের আলোচ্য বিষয়সকলের একটা মোটামুটি জ্ঞান লাভের আকাঙ্ক্ষা আছে, অথচ ন্যায়ের সংস্কৃত গ্রন্থাদি পাঠ করিবার সুবিধা বা সময় নাই। আশা করি, অতি সরল ভাষায় লিখিত এই গ্রন্থখানা পাঠ করিলে তাহাদিগের অভিলাষ কতক পরিমাণে পূর্ণ হইতে পারে। আর যাহারা চতুষ্পাঠীতে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রের ডিগ্রির পরীক্ষার জন্য ন্যায় optional subject নেন, বাঙ্গালা ভাষায় রচিত বলিয়া অবজ্ঞার চক্ষুতে না দেখিলে, আশা করি গ্রন্থখানা তাহাদিগেরও কাজে লাগিতে পারে। যদি তাহা হয়, তবে জীবন-সায়াহ্নের সকল পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে করিব।

প্রমাণ (Epistemology) এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়, সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক মতে, পারমার্থিক সত্তা কি বা কি কি, এই বিষয়ে মূল গ্রন্থে কোনো আলোচনা করা হয় নাই। হয়ত পাঠকের এই বিষয়েও একটা

মোটামুটি জ্ঞান লাভের কৌতূহল হইতে পারে, এই মনে করিয়া পরিশিষ্টে যথাসম্ভব অল্প কথায় পারমার্থিক সত্তা সম্বন্ধেও ভারতীয় দার্শনিক মতসকলের একটু আভাস দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। আশা করা যায় যে, গ্রন্থখানা পাঠ করিলে, পাঠক ভারতীয় দর্শনের প্রমাণ (Epistemology) সম্বন্ধে বিস্তারিত এবং পারমার্থিক তত্ত্ব (Ontology) সম্বন্ধে একটা মোটামুটি জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন।

গ্রন্থকার।

মুখপত্র।

প্রমাবিজ্ঞান বা Epistemology নবাবিষ্কৃত বিজ্ঞানগুলির মধ্যে অন্যতম না হ'লেও, পৃথক ভাবে এ বিজ্ঞানের আলোচনা দর্শনের ইতিহাসে অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের ঘটনা-ই বলতে হবে। সভ্যতার প্রথম যুগে মানুষের অনুসন্ধিৎসু মন তার তীক্ষ্ণ মেধার সাহায্যে ইন্দ্রিয়গোচর পরিবর্ত্তনশীল জগতের অন্তরালে যে নিবিড় রহস্য লুকানো আছে তারই উদ্ঘাটনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল; এবং বাধা পেয়েছে যত, ততই তার কৌতূহল হয়েছে তীব্রতর। সেজন্য Ontology বা পারমার্থিক সত্তাবিজ্ঞানই প্রাচীন দার্শনিকদের চিন্তাকে বেশী করে' অধিকার করেছিল। এই দিকে চিন্তাকে পরিচালনা করে' নানা বিরুদ্ধ তথ্যের সমন্বয় সাধনের দুঃসাধ্য প্রয়াস মানুষকে চিরকালই করতে হয়েছে, কিন্তু সব সময় তার চেষ্টা সফল হয়নি। তাই প্রমাবিজ্ঞানের সমস্যাগুলি অতি প্রাচীনকালেও উদিত হয়েছিল। গ্রীক দার্শনিকদের মধ্যেও সে সম্বন্ধে আলোচনা পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত ভাবে, বিধিবদ্ধ ভাবে কিম্বা পৃথক বিজ্ঞান হিসাবে নয়—এমন কি এরিষ্টটলের মধ্যেও নয়। পৃথক ভাবে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রমাণ সম্বন্ধে আলোচনা করেন সর্ব্বপ্রথমে বোধ হয় জন্ লক্—তার বিখ্যাত পুস্তক Essay concerning Human understandingএর মধ্যে। দর্শনশাস্ত্রে প্রমাবিজ্ঞানের প্রাধান্য ও প্রয়োজনীয়তা ইতিমধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে স্বীকৃত হলেও স্পষ্টতঃ স্বীকৃত হয় এই প্রথম। তাই য়ুরোপীয় দর্শনশাস্ত্র প্রমাবিজ্ঞান ও তত্ত্ব-বিজ্ঞানের (Epistemology and ontology) সম্বন্ধটা যেন একটু উল্টিয়ে দিয়েছে। ঠিক ধরতে গেলে, অর্থাৎ ন্যায়শাস্ত্রের (logical) পারম্পর্য্যের নিয়মে, প্রমাবিজ্ঞানের আলোচনার দাবিই প্রথমে—অর্থাৎ সেই আলোচনার ফলে বিভিন্ন প্রমাণগুলি সঠিক নিরূপিত হ'লে তার পরেই তত্ত্ববিজ্ঞানের আলোচনা উঠতে পারে। আসলে কিন্তু হয়েছে ঠিক এর উল্টো। অর্থাৎ তত্ত্ববিজ্ঞানের আলোচনা করতে গিয়ে ঠেকে এবং ঠকে য়ুরোপীয় দার্শনিকেরা প্রমাবিজ্ঞানের বিধিবদ্ধ আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে কিন্তু এ কথা ঠিক বলা চলে না। সেখানে প্রমাবিজ্ঞান ও তত্ত্ববিজ্ঞান স্বতঃই স্ব স্ব স্থানটী গ্রহণ করেছে বলে মনে হয়। য়ুরোপীয় ও ভারতীয় দর্শনের মূল দৃষ্টিভঙ্গী ও পরিপ্রেক্ষণার পার্থক্যের জন্যই এমনটা সম্ভব হয়েছে। য়ুরোপে তত্ত্ববিজ্ঞানের আলোচনা হয়েছে প্রধানতঃ জ্ঞান-লাভেরই জন্য—অর্থাৎ Knowledge for its own sakeএর অনুপ্রেরণায়। ভারতে কিন্তু জ্ঞানলাভের অনুপ্রেরণা এসেছে বাইরে থেকে অর্থাৎ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির জন্য। এই চরম সমস্যা সমাধানের জন্যই ভারতের সমস্ত চিন্তা পরিচালিত হয়েছে। দুঃখ নিবৃত্তি অর্থাৎ মোক্ষলাভের জন্যই তাহার সাধন হিসাবে তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা, এবং তত্ত্ববিজ্ঞানের সাধন হিসাবে প্রমাবিজ্ঞানের আলোচনা। সেই হেতু ভারতীয় বিভিন্ন দর্শনগুলির মধ্যে কোন কোনটাতে তত্ত্ববিজ্ঞান অপেক্ষা প্রমাবিজ্ঞান বেশী এবং কোন কোনটাতে কম আলোচিত হ'লেও সর্ব্বত্রই দুটি বিজ্ঞানের ন্যায় সম্মত (logical) পরস্পর সম্বন্ধটি অটুট আছে।

হিন্দুদর্শন সম্বন্ধে বহু পুস্তক ইংরেজীতে রচিত হয়েছে; এবং সেগুলিতে হিন্দু-প্রমাবিজ্ঞানের আলোচনাও আছে। কিন্তু হিন্দু প্রমাবিজ্ঞানের একটা পৃথক আলোচনা ইতিপূর্ব্বে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। এই হিসাবে পুস্তিকাটির একটা বৈশিষ্ট্য আছে এবং বাংলাভাষায় দর্শনের আলোচনার ক্ষেত্রে পুস্তিকাটী একটী নূতন রূপ দিয়েছে। শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র ন্যায়বাগীশ মহাশয় বাংলা সাহিত্যকে যে সব বহুমূল্যবান পুস্তক দান করেছেন, এখানি তাদের মধ্যে একটি। প্রমাবিজ্ঞানের সঙ্গে ন্যায়শাস্ত্রের (logic) ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। এই পুস্তিকাটিতে অনুমান প্রমাণের আলোচনা প্রসঙ্গে হিন্দু ন্যায়ের সহিত য়ুরোপীয় লজিকের অতি প্রাঞ্জল, শিক্ষাপ্রদ ও হৃদয়গ্রাহী আলোচনা আছে। ন্যায়ের জটিল সূত্রগুলির মর্ম্মোদ্‌ঘাটনে অনেক সময়ে আমাদের, এমন কি বিখ্যাত ভাষ্যকারদের চিন্তাতেও, অস্পষ্টতা এসে পড়ে। শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র ন্যায়বাগীশ মহাশয়ের চিন্তাশক্তির অসাধারণ স্বচ্ছতায় সে সব অস্পষ্টতা অনেক ধরা পড়েছে ও দূর হয়েছে। সুতরাং এ পুস্তিকাটি সর্ব্বতোভাবেই প্রণিধানযোগ্য এবং মনোযোগ সহকারে পাঠ করলে লাভবান হবেন না, এমন পাঠক কমই আছেন। পরীক্ষার্থীদের ত কথাই নাই। বি. এ. কিম্বা এম. এ. যে কোন পরীক্ষায় দর্শনশাস্ত্রের

পরীক্ষার্থীরা এ বই পড়লে প্রভূত উপকার পাবে, সে বিষয়ে কোনোও সন্দেহ নাই। এমন কি আই. এ. পরীক্ষার্থীদের পক্ষেও বইখানি যথেষ্ট প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য। য়ুরোপীয় লজিকের সঙ্গে ভারতীয় ন্যায়ের তুলনামূলক আলোচনাটি পড়লে তাদেরও পাঠ্য বিষয়টি আয়ত্ত করা অনেক বেশী সহজসাধ্য হবে।

বাঙ্গালা সাহিত্যে শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র ন্যায়বাগীশ মহাশয়ের কোনও পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন; কিন্তু বর্ত্তমান পুস্তিকাটি রচনা প্রসঙ্গে দুই একটি কথা পাঠকদের নিবেদন করতে চাই। লেখকের বয়স একাশী বছর পার হয়ে গিয়েছে এবং তদুপরি তিনি বর্ত্তমানে কয়েক মাস যাবৎ শয্যাশায়ী আছেন। এই পুস্তিকাখানি তাঁর রোগশয্যায় রচিত এবং স্বহস্তে লেখনী ধারণের শক্তির অভাব ঘটায় তাঁর মৌখিক বিবৃতি থেকে অন্য কর্ত্তৃক অনুলিখিত। এতখানি বয়সে এই সব প্রতিকূল অবস্থাতেও তাঁর মেধা একটুও ম্লান হয়নি, তাঁর চিন্তাশক্তির স্বচ্ছতার একটুও হ্রাস হয়নি, তাঁর উদ্যমেরও এতটুকুও অভাব ঘটেনি। এ কথা চিন্তা করলে পাঠকের মন স্বতঃই বিস্ময়ে ও কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠবে। তাই, শুধুই আমার নিজের তরফ থেকে নয়, নিঃসঙ্কোচে বাংলা সাহিত্যের বহু পাঠকবৃন্দের তরফ থেকেও তাঁর প্রতি আমাদের ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি।

শ্রীসুশীলচন্দ্র মিত্র,
(এম-এ, ডি-লিট)।
প্রেসিডেন্সী কলেজের দর্শনশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক,
রিপণ কলেজের দর্শনশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব প্রধান অধ্যাপক।

সূচীপত্র।

প্রমাণ।

প্রত্যক্ষ।

অনুমান।

উপমান।

শব্দ।

পরিশিষ্ট।

হিন্দু প্রমাবিজ্ঞান (Epistemology)

বা

ন্যায়-সোপান।

'প্রমা' শব্দের অর্থ প্রকৃষ্ট জ্ঞান বা জানা। যে বস্তু প্রকৃত পক্ষে যাহা তাহাকে সেইরূপ জানাই তাহার প্রকৃষ্ট জ্ঞান। যে উপায়ে এই প্রকার জ্ঞান লাভ হয় তাহার নাম প্রমাণ। যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে প্রকৃত জানা কি, তাহা লাভের উপায়ই বা কি এবং এই বিষয়ে আমাদের সামর্থ্যই বা কতটুকু আছে, তাহা জানিতে পারা যায় তাহার নাম প্রমা-বিজ্ঞান। প্রমাবিজ্ঞান কথাটির ইংরেজী প্রতিশব্দ Epistemology। যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে পারমার্থিক সত্তা কি বা কি কি এবং তাহাদিগের স্বরূপই বা কি, এই সকল জানিতে পারা যায় তাহাকে বলে পারমার্থিক সত্তা-বিজ্ঞান বা তত্ত্ববিদ্যা। পারমার্থিক সত্তাবিজ্ঞানের ইংরেজী প্রতিশব্দ Ontology.

ভারতীয় দর্শনসকলকে মোটের উপর তুই শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারা যায়—আস্তিক এবং নাস্তিক। যে সকল দর্শনে বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়াছে, তাহারা আস্তিকদর্শন। সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্ব্ব ও উত্তর মীমাংসা, ইহারা আস্তিক দর্শন। ইহাদিগকে ষড়দর্শনও বলা হইয়া থাকে,—সংখ্যায় ছয়খানা বলিয়া ষড়দর্শন।

যে সকল দর্শনে বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত হয় নাই, তাহারা নাস্তিকদর্শন। চার্ব্বাকদর্শন, মাধ্যমিক, যোগাচার সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক প্রভৃতি বৌদ্ধদর্শন এবং জৈনদর্শন সকল নাস্তিকদর্শন।

একটি মনে রাখিবার বিষয় এই যে, আস্তিক নাস্তিক বলিতে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বা নাস্তিত্বে বিশ্বাস কি অবিশ্বাস বোঝায় না। সাংখ্য এবং পূর্ব্বমীমাংসা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নহে। তথাপি ইহারা আস্তিকদর্শন। যদিও সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায় এবং বৈশেষিক ইহারা সকলই আস্তিকদর্শন, তথাপি একটি বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় এই যে, এই সকল দর্শনে যুক্তির উপরে যতটা ঝোঁক বেদবাক্যের উপর ঝোঁক তত নহে। সাংখ্যদর্শনে কেবল প্রতি-পক্ষের যুক্তি খণ্ডনের জন্যই স্থানে স্থানে শ্রুতি প্রমাণের উল্লেখ:করা হইয়াছে। পূর্ব্বমীমাংসা এবং উত্তরমীমাংসা ইহারা খাটি আস্তিক দর্শন। এই দুই দর্শনে যুক্তি এবং শ্রুতির বিরোধ স্থলে স্পষ্ট ভাষাতেই যুক্তি বর্জ্জন করিয়া শ্রুতি বাক্যের প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে।

নাস্তিকদর্শনই হউক বা আস্তিকদর্শনই হউক সকলের মধ্যেই প্রমাণ এবং প্রমেয় অর্থাৎ পারমার্থিক তত্ত্ব কি এবং ইহা জানিবার উপায় কি এই সকল বিষয় অল্পবিস্তর আলোচনা আছে। সুতরাং ভারতীয় দর্শনসকল একাধারে প্রমাবিজ্ঞান (Epistemology) এবং পারমার্থিক তত্ত্ব-বিজ্ঞান (Ontology)। কিন্তু তাহা হইলেও তাহাদিগের প্রত্যেকের মধ্যেই যে এই দুই বিষয়ের সমান ভাবে আলোচনা হইয়াছে তাহা নহে। কোনটির মধ্যে প্রমাণের আলোচনার উপর ঝোঁক বেশি আবার কোনটির মধ্যে প্রমেয়ের অর্থাৎ পারমার্থিক তত্ত্বের আলোচনার উপর ঝোঁক বেশি। ন্যায় এবং পাতঞ্জলদর্শন প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত এবং বৈশেষিক, সাংখ্য ও মীমাংসাদর্শন দুইটি দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত।

পাতঞ্জলদর্শনকে সাধারণতঃ যোগদর্শন বলা হইয়া থাকে। ন্যায় এবং যোগদর্শনের নামেই বলিয়া দেয়, তাহাদিগের আলোচ্য বিষয় প্রধানতঃ কি। 'ন্যায়' শব্দের অর্থ অনুমান প্রণালী বা অনুমান প্রকাশক বাক্যাবয়ব সমষ্টি (Syllogism)। ন্যায়-

দর্শনের আর এক নাম আন্বীক্ষিকীবিদ্যা। অন্বীক্ষা এবং অনুমা একার্থবোধিকা। ন্যায়দর্শনের প্রধান আলোচনার বিষয়ই হইয়াছে অনুমান প্রমাণ এবং ইহার সংসৃষ্ট বিষয়সকল, যথা বাদ, নির্ণয়, জল্প, বিতণ্ডা, ছল, হেত্বাভাস, জাতি এবং নিগ্রহ স্থান। এই সকল বলিতে কি বোঝায় পরে তাহার আলোচনা করা যাইবে। 'যোগ' শব্দের অর্থ ধ্যেয় বিষয়ে চিত্তকে কেন্দ্রীভূত করা। কি প্রকার সাধনা দ্বারা চিত্তকে কেন্দ্রীভূত করিয়া ইহার অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করা যায়, ইহা শিক্ষা দেওয়াই যে যোগদর্শনের প্রধান লক্ষ্য তাহা দর্শনটির নাম হইতেই বুঝিতে পারা যায়। ন্যায় এবং যোগদর্শনকে প্রমা-বিজ্ঞান বলিলেও কথায় ভুল হইবে না।

বৈশেষিকদর্শনে প্রমাণের আলোচনা সংক্ষিপ্ত কিন্তু প্রমেয়ের আলোচনা বিস্তৃত, তেমন আবার সাংখ্যে প্রমেয়ের আলোচনা বিস্তৃত, প্রমাণের আলোচনা সংক্ষিপ্ত। বৈশেষিকের অভাব ন্যায়ে এবং ন্যায়ের অভাব বৈশেষিকে পূর্ণ, সাংখ্যের অভাব পাতঞ্জলে এবং পাতঞ্জলের অভাব সাংখ্যে পূর্ণ। বৈশেষিক এবং ন্যায়, ও সাংখ্য এবং পাতঞ্জল, ইহাদিগকে পরস্পর পরস্পরের প্রপূরক (Complementary) দর্শন মনে করা যাইতে পারে।

প্রমার লক্ষণ কি ?

'প্রমা' শব্দটির ধাতুগত অর্থ প্রকৃষ্ট জ্ঞান বা জানা। তাহা হইলে প্রমা-বিজ্ঞানের গোড়াতেই কথা উঠে, জানা কাহাকে বলে, জানা বলিতে আমরা কি বুঝি, জানার লক্ষণ কি ? জানা এমনই একটা বিষয় যে, ইহা দ্বারা কি বুঝায় তাহা আমরা সকলেই জানি। সকলের নিকটই ইহার অর্থ সুস্পষ্ট। অথচ কোনো প্রকার লক্ষণ দিয়াই ইহাকে স্পষ্টতর করা যায় না। কেননা

কোনও পদার্থের লক্ষণ দিতে গেলেই ইহা যে জাতীয় পদার্থের অন্তর্গত তাহা উল্লেখ করিয়া তাহার ব্যাবর্ত্তক গুণের উল্লেখ করিতে হয়। জানা কোন জাতির অন্তর্ভূত নহে এবং ইহা নিজেই ইহার ব্যাবর্ত্তক। যেরূপ ভাবেই জানার লক্ষণ দিবার চেষ্টা করা হউক না কেন, লক্ষণে জানা কথা বা ইহার এক পর্য্যায়ের শব্দ ব্যবহার করিতেই হয়। ইহাতে জানা কথা দ্বারা কি বুঝায় তাহা এক ভাবে না এক ভাবে জানা কথা দ্বারাই ব্যাখ্যা করা হয় মাত্র। সুতরাং জানা নিজেই নিজের লক্ষণ; ইহাকে কোনও লক্ষণ দ্বারা স্পষ্টতর করিয়া বোঝান যায় না।

সুপ্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য দার্শনিক ক্যান্ট জানা বলিতে কি বুঝা যায় তাহার বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া বলেন যে অন্য প্রত্যয় (idea) নিরপেক্ষভাবে কেবল একটি প্রত্যয়ের জ্ঞানকে জানা বলে না। প্রত্যেক জানার মধ্যে একটি প্রত্যয়ের উদ্দেশ্যে আর একটি প্রত্যয়ের বিধান থাকে—অন্বয়ী (affirmative) ভাবেই হউক বা ব্যতিরেকী (negative) ভাবেই হউক। প্রত্যেক জানার মধ্যেই উদ্দেশ্য (subject) এবং বিধেয় (predicate) এই উভয়ই থাকে। সুতরাং জানা মাত্রই এক একটি অবগতি (judgement)। জানা মাত্রই অবগতি হইলেও, অবগতি মাত্রই জানা নহে। কোনও অবগতিকে, জানা হইতে হইলে, ইহাতে কেবল আকারগত (formally) ভাবে উদ্দেশ্য এবং বিধেয় থাকিলে চলিবে না। ইহাকে প্রকৃতপক্ষে সত্যও হইতে হইবে। আকাশে উড্ডীয়মান অশ্ব। ইহা একটি অবগতি। কিন্তু ইহাকে, জানা আখ্যা দেওয়া যায় না। কেননা, ইহা প্রকৃতপক্ষে সত্য নহে।

জানাও দুই প্রকার। সংশ্লেষণাত্মক (synthetical) এবং বিশ্লেষণাত্মক (analytical)। যে জানাতে, বিধেয়, উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোনও নূতন তত্ত্ব প্রকাশ করে না, ইহা বিশ্লেষণাত্মক।

যেমন শরীর বিস্তার বিশিষ্ট। শরীর কথা দ্বারাই, ইহা যে বিস্তার বিশিষ্ট, তাহা বুঝা যায়। ইহাতে বিধেয়, উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোনও নূতন তত্ত্ব প্রকাশ করে না। কিন্তু, অগ্নি ধাতুর আয়তন বাড়ায়, এই অবগতিতে উত্তাপ যে ধাতুর আয়তন বাড়ায়, এই একটি নূতন তত্ত্ব আছে। কেবল 'ধাতু' শব্দের অর্থ হইতে ইহা জানা যায় না। ইহা একটি সংশ্লেষণাত্মক অবগতি। আবার কোনও অবগতিকে বৈজ্ঞানিক জানা হইতে হইলে, ইহাকে সর্ব্বকালে এবং সর্ব্ব অবস্থায়ও সত্য হইতে হইবে। আজ এখানে গরম পড়িয়াছে, ইহা একটি সংশ্লেষণাত্মক অবগতি। কিন্তু ইহা বৈজ্ঞানিক জানা নহে। কারণ আজ এখানে গরম পড়িয়াছে, কাল এখানে গরম নাও থাকিতে পারে। উত্তাপ ধাতুর আয়তন বৃদ্ধি করে, ইহা একটি বৈজ্ঞানিক জানা বা জ্ঞান। কারণ, ইহা সকল সময়েই সত্য।

প্রত্যেক জানার মধ্যেই এক একটি বিধেয় থাকে। যত প্রকারের প্রত্যয় বিধেয় হইবার সম্ভব, ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিকগণ, ভিন্ন ভিন্ন ভিত্তির উপরে, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তাহাদিগের শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন। এই সকলকে বলা হয় বিধেয় (categories)। ভারতীয় দার্শনিকগণ এই সকলকে বলেন পদার্থ। ইহাদিগের একটি না একটি পদমাত্রেরই অর্থ, এইজন্য ইহাদিগকে বলা হয় পদার্থ এবং প্রত্যেক জানার মধ্যেই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ইহাদিগের একটি না একটিকে বিধান করা হয় বলিয়া ইহাদিগকে বলা হয় বিধেয় (predicables)।

এই বিধেয় সকলের, যে ভাবেই শ্রেণী বিভাগ করা হউক না কেন, তাহাদিগের মধ্যে দ্রব্য (substance), দেশ (space), কাল (time) এবং কার্য্য কারণ সম্বন্ধ (causality) এই কয়টিই প্রধান এবং বিশেষ ভাবে সমালোচনার যোগ্য। প্রত্যেক জানার

মধ্যেই এক ভাবে না এক ভাবে, উদ্দেশ্য সম্বন্ধে, এই সকলের বিধান থাকে। আমি বলিলাম, আমি এই বৃক্ষটিকে জানি। একটু সূক্ষ্ম ভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, আমার এই জ্ঞানের মধ্যে দেশের জ্ঞান, কালের জ্ঞান, কার্য্যকারণ সম্বন্ধের এবং দ্রব্যের জ্ঞানও অল্পবিস্তর রহিয়াছে। বৃক্ষটিকে যখন জানি, ইহাকে দেশ এবং কালগতভাবেই জানি। ইহাকে আমার সংবেদনের (sensationএর) কারণ বলিয়াই জানি। কেবল তাহা নহে, ইহা যে শক্তি বা গুণের দ্বারা আমার সংবেদনের কারণ হইয়াছে, ইহা যে সেই শক্তি বা গুণের আশ্রয় তাহা বলিয়াও জানি।

জানা সম্বন্ধে আর একটি জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে আমাদিগের জ্ঞান মাত্রই সাপেক্ষিক। আমি যখন বলি "আমি এই বস্তুটি জানি" তখন আমি এই বলি যে, ইহা আমার নিকট যে ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে সেই ভাবেই জানি। সুতরাং প্রত্যেক বস্তুর জ্ঞানই জ্ঞাতা সাপেক্ষ। আবার প্রত্যেক বস্তুই যে সকল জ্ঞাতার নিকট একই ভাবে প্রকাশিত হইবে তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই। এইজন্যই প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক প্রোটাগরাস্ বলেন যে, ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞাতার নিকট যখন একই সত্তা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পরিজ্ঞাত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, তখন কোনও বস্তুরও প্রকৃত স্বরূপের অর্থাৎ ইহা অন্য নিরপেক্ষ ভাবে কি তাহার জ্ঞান হইতে পারে না। প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের জ্ঞানই তাহার জ্ঞানের মাপকাঠি। (the individual man is the measure of all things)।

আমাদিগের জ্ঞান যে কেবল জ্ঞাতা সাপেক্ষ তাহা নহে। ইহা অন্য বস্তুর জ্ঞান সাপেক্ষও বটে। আমি যখনই কিছু একটা জানি, ইহা অন্য বস্তুর সঙ্গে তুলনায়ই জানি। জানা কথা দ্বারা

সর্ব্বদাই ইতর বস্তু হইতে পৃথক্‌রূপে জানাই বোঝায়, জানা, পার্থক্যের জ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই নহে।

অতএব আমরা দেখিতে পাই আমাদিগের প্রত্যেক বস্তুর জ্ঞানই যে কেবল জ্ঞাতাসাপেক্ষ তাহা নহে, ইহা অন্য বস্তুর জ্ঞানসাপেক্ষও বটে। সুতরাং আমাদিগের প্রত্যেক জ্ঞানই সাপেক্ষিক (Relative)। জ্ঞান সম্বন্ধে যাহাদিগের এই মত তাহাদিগকে বলা হয় সাপেক্ষ জ্ঞানবাদী (Relativists)।

এখন একটী প্রশ্ন স্বতঃই মনে উঠে। তাহা এই :—দর্শনের লক্ষ্য হইল পারমার্থিক তত্ত্ব জানা। 'অনেক কোন দার্শনিক মনে করেন—যাহা পারমার্থিক, তাহা সর্ব্বতোভাবে অন্যনিরপেক্ষ (absolute)। জ্ঞান মাত্রই যখন সাপেক্ষিক, তখন যাহা সর্ব্ব-নিরপেক্ষ তাহাকে জানা সম্ভব হইবে কিরূপে ?

কোনও একটা বস্তুকে জানিতে হইলে, ইহাকে একটা অবস্থার (condition এর) মধ্যে আনিতে হয়। সুতরাং যাহা সর্ব্ব অবস্থা নিরপেক্ষ (unconditioned), তাহাকে অবস্থার মধ্যে আনা যায়, ইহাত এক অর্থশূন্য কথা। আমরা যখন কোনও বস্তুকে জানি, তখন ইহাকে অন্যের সঙ্গে তুলনায়ই জানি—অন্যের সঙ্গে সম্বন্ধ বিশিষ্ট বলিয়াই জানি। সুতরাং যাহা অসীম, সর্ব্ব-নিরপেক্ষ (infinite, absolute) তাহাকে জানিবার কোনও উপায় নাই। যাঁহারা মনে করেন এইরূপ কোনও সত্তা হয়ত বা আছে, হয়ত বা নাই তাঁহারা সন্দেহবাদী; আর যাঁহারা মনে করেন এইরূপ সত্তা আছে ; কিন্তু ইহা অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয়, তাঁহারা অজ্ঞেয়বাদী। আর এক শ্রেণীর দার্শনিকগণ আছেন, যাঁহারা এই কথা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে, যদিও আমাদিগের জ্ঞান সাপেক্ষিক তথাপি আমরা সর্ব্বনিরপেক্ষ সত্তার জ্ঞানলাভ করিতে পারি না, এই কথা ঠিক নহে। আমরা এমন কোনও একটা ভাব মনে

আনিতে পারি না, যাহার সঙ্গে ইহার বিরুদ্ধভাবও মনে না আসে। এই প্রকার ভাবযুগলকে বলা হয় প্রতিযোগী ভাব। নিরপেক্ষ, সাপেক্ষ, ব্যবহারিক, পারমার্থিক, অসীম, সসীম, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় প্রভৃতি প্রতিযোগী ভাব। ইহাদিগের কোনও একটির কথাও ইহার প্রতিযোগীকে বাদ দিয়া আমরা মনে আনিতে পারি না। যখন সসীমকে জানি, তখন যে ইহাকে অসীম হইতে ভিন্ন বলিয়াই জানি, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। অসীমের কতকটা জ্ঞান না থাকিলে, সসীমকে অসীম হইতে ভিন্ন বলিয়া জানিব কিরূপে? অসীমের সঙ্গে তুলনাতেই সসীমকে জানি। সেইরূপ ব্যবহারিক সত্তার (phonomenon এর) জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই পারমার্থিক সত্তারও (noumenon) জ্ঞান থাকে। জ্ঞাতা হইতে হইলে জ্ঞেয়রই জ্ঞাতা হইতে হয়, এবং জ্ঞেয় হইতে হইলেও জ্ঞাতারই জ্ঞেয় হইতে হয়, একটিকে বাদ দিয়া অপরটির কথা মনে আনা যায় না। সাপেক্ষের (Relative এর) জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই নিরপেক্ষেরও (absolute এর) জ্ঞান থাকে। এমন কি সাপেক্ষের জ্ঞানের জন্য, নিরপেক্ষের কতকটা জ্ঞান পূর্ব্ব হইতেই থাকা প্রয়োজন (a prior logical condition), সুতরাং আমরা যে কেবল নিরপেক্ষকে জানি তাহা নহে, সাপেক্ষকে জানিবার পূর্ব্বেই ইহাকে জানি এবং ইহার স্বরূপও অবশ্য কতকটামাত্রই জানিতে পারি। নতুবা সাপেক্ষের সহিত তুলনামূলক জানার কোনও অর্থ থাকে না।

এই কথাটা, ভারতীয় উপনিষদে যে দার্শনিক তত্ত্বের উল্লেখ আছে, তাহাতে অতি সুন্দর ভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে, সর্ব্ব নিরপেক্ষ সত্তা ব্রহ্মকে জানি বলিয়া যে বলে, সে তাঁহাকে কিছুই জানে না। যে বলে আমি ইহাকে জানি না, সেও জানে না। যে বলে জানি না ইহাও বলিতে পারি না, এবং জানি ইহাও বলিতে পারি না, সেই ঠিক জানে।

নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।
যো ন স্তবেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ॥ কেনোপনিষৎ।

ইহার অর্থ এই যে, যাহা সর্ব্বনিরপেক্ষ অসীম, তাহার সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞানও সম্ভবপর নহে। তাঁহাকে জানার অর্থ হইয়াছে কতকটা মাত্র জানা।

উপরে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাতে যে জানার একটা সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এবং ইহার সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে, ইহা সত্য। এমন ইহাতে পারমার্থিক সত্তাকে জানিবার জন্য আমাদিগের কতকটা যোগ্যতা আছে তাহারও কতকটা আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার মধ্যেও আমরা জানার কোন লক্ষণ পাই না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ন্যায়দর্শনকে প্রমাবিজ্ঞান বলিলেও কথায় ভুল হইবে না। ন্যায়দর্শনের একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে সকল জ্ঞাতব্য বিষয় সকলের লক্ষণ দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ন্যায়দর্শনকে লক্ষণমালা বলিলেও কথায় বিশেষ ভুল হইবে না। এমন যে ন্যায়দর্শন, ইহাতেও জানার লক্ষণ দিবার চেষ্টা করা হয় নাই। ইহার সহিত কয়েকটি এক পর্য্যায়ের শব্দ উল্লেখ করিয়াই ইহা কি তাহা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। "বুদ্ধিরুপলব্ধির্জ্ঞানমিত্যনর্থান্তরম্" (ন্যায়সূত্র ১৫।১)। বুদ্ধি উপলব্ধি এবং জ্ঞান ইহারা একার্থবোধক। প্রকৃত প্রস্তাবে জানা বলিতে কি বোঝায় তাহা সকলই জানে—শিক্ষিত লোকেও জানে; অশিক্ষিত লোকেও জানে, ইহাকে লক্ষণ দিয়া প্রকাশ করিতে গেলে যাহা সকলের নিকট সুস্পষ্ট তাহাকে বাক্যজালে জড়াইয়া অস্পষ্ট করা হয় মাত্র।

যদিও প্রমা বা জানার লক্ষণ দেওয়া যায় না, প্রমাণ বা জানার উপায় সকলের লক্ষণ দেওয়া যায় এবং শ্রেণী বিভাগও করিতে

পারা যায়। প্রমাণের বিস্তারিত আলোচাই ভারতীয় প্রমা-বিজ্ঞানের বিশেষ আলোচনার বিষয়।

প্রমাণ

প্রমা করণং প্রমাণম্। প্রমার যাহা করণ, তাহাই প্রমাণ। করণ কথাটির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে ভারতীয় দার্শনিকগণ কার্য্য কারণ সম্বন্ধের দ্বারা কি বুঝিতেন, তাহার স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। তাঁহাদিগের মতে, যাহার পূর্ব্বে অভাব থাকে তাহাই কার্য্য। নব্য নৈয়ায়িকদিগের ভাষায় "প্রাগভাব প্রতিযোগিত্বং কার্য্যত্বম্।" কোনো বস্তুর অভাবের প্রতিযোগী সেই বস্তুই; সুতরাং সংজ্ঞাটির সহজ ভাব এই যে, যাহা পূর্ব্বে ছিল না কিন্তু এখন আছে তাহাই কার্য্য। আরও সহজ ভাষায় এই বলা যাইতে পারে, যাহার আরম্ভ বা আদি আছে তাহাই কার্য্য। কোন কোন দার্শনিক আরম্ভ থাকাকেই কার্য্যের লক্ষণ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। পাশ্চাত্য দার্শনিক মিলের মতেও যাহার আদি আছে তাহাই কার্য্য। প্রাগ্ভাব প্রতিযোগী হওয়া, আর আরম্ভ থাকা বা আদি থাকা, ইহারা সকলেই একার্থ বোধক।

যে সকল অবস্থা কার্য্যের নিয়ত পূর্ব্বভাবী অর্থাৎ অন্য অবস্থা যাহাই হউক না কেন, যাহারা সর্ব্বতোভাবে অন্য নিরপেক্ষ হইয়া কার্য্যের পূর্ব্বে থাকে, যাহাদিগের সমাবেশ হওয়া মাত্রই কার্য্য ঘটে তাহারা কার্য্যের কারণ। "কার্য্যস্য নিয়তপূর্ব্ববৃত্তিত্বং কার্য্য-ত্বম্।" কথাটি, একটি উদাহরণ দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। একটি দিয়াশলাইএর কাঠি বাক্সের খরখরে পিঠে ঘসা দেওয়া মাত্রই জ্বলিয়া উঠিল। জ্বলন্ত অগ্নিশিখার পূর্ব্বে অভাব ছিল সুতরাং ইহা একটি কার্য্য। দিয়াশলাইএর কাঠি সংলগ্ন দাহ্য-

পদার্থ, বাক্সের গায়ের খরখরে অবস্থা, এবং ইহার সহিত সংঘর্ষণ, এই তিনটি ব্যাপারের সমাবেশই অগ্নিশিখার সর্ব্বতোভাবে অন্য নিরপেক্ষ পূর্ব্বভাবী। ইহাদিগের কোনও একটির অভাব হইলে কার্য্যটি ঘটিত না এবং ইহাদিগের সমাবেশে কার্য্যটি ঘটা অপরিহার্য্য। দিয়াশলাইএর কাঠির মাথায় দাহ্যবস্তু, বাক্সের গায়ের খরখরে অবস্থা এবং দাহ্য বস্তুর সংঘর্ষণ এই তিনটি একত্র সমাবিষ্ট হওয়াই কার্য্যটির কারণ। এই তিনটি, অগ্নিজ্বলারূপ কার্য্যের নিয়ত পূর্ব্বভাবী। ইহাদিগের যেটির সকলের শেষে সমাবেশ হইয়াছে অর্থাৎ যেটি ঘটামাত্রই কার্য্যটি ঘটিল, কারণের এই অংশটিকেই বলা হয় তাহার করণ। ইহাই অগ্নি জ্বলারূপ ব্যাপারের অব্যবহিত পূর্ব্বভাবী। উল্লিখিত উদাহরণ বাক্সের খরখরে পীঠের সঙ্গে দাহ্য পদার্থের সংঘর্ষণই অগ্নি জ্বলারূপ কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্বভাবী। ইহাই ইহার করণ।

কোনও বিষয়কে জানা বা ইহার প্রমাও একটি কার্য্য। জানা ব্যাপার অব্যবহিত পূর্ব্বভাবীরূপ, ইহার কারণের যে অংশ ইহাই তাহার করণ বা প্রমাণ। করণ সম্বন্ধে সংক্ষেপে এই স্থানে এই মাত্রই বলা হইল। পরে প্রত্যেক শ্রেণীর প্রমাণ আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে প্রমার করণ বিষয়েও বিশেষ আলোচনা করা যাইবে।

ভারতীয় দার্শনিকদিগের মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, উপমান, অর্থাপত্তি, অভাব, সম্ভব, ইতিহাস এই কয়েকটি প্রমাণ। অবশ্য সকল দার্শনিকই যে ইহাদিগের প্রত্যেকটিকেই প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন তাহা নহে।

"প্রত্যক্ষমেকং চার্ব্বাকাঃ কণাদসুগতৌ পুনঃ।
অনুমানঞ্চ তচ্চাপি সাংখ্যাঃ শব্দং চ তে অপি॥
ন্যায়ৈকদেশিনোপ্যেবমনুমানঞ্চ কেচন।
অর্থাপত্ত্যা সহৈতানি চত্বার্যাহুঃ প্রাভাকরাঃ॥

অভাব ষষ্ঠান্যেতানি ভাট্টাবেদান্তিনস্তথা।
সম্ভবৈতিহ্য যুক্তানি তানি পৌরণিকা জগুঃ॥”

চার্ব্বাকগণ কেবল প্রত্যক্ষকেই প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন। কণাদ এবং সৌগতগণ প্রত্যক্ষ এবং অনুমান এই উভয়কেই প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন। সাংখ্যদর্শনে এই দুইটী এবং শব্দও প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। নৈয়ায়িকদিগের মধ্যে কেহ কেহ এই ছাড়া উপমানকেও প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন। প্রাভাকর-গণ এই চারিটি এবং অর্থাপত্তিকেও প্রমাণ বলেন। ভাট্ট্যা এবং বৈদান্তিকদিগের মতে এই পাঁচ প্রকার প্রমাণ এবং অভাবও প্রমাণশ্রেণীর অন্তঃর্গত। পৌরাণিকগণ এই ছয় প্রকার প্রমাণ ছাড়া সম্ভব এবং ইতিহাসকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন।

প্রত্যক্ষ

গোতমের ন্যায়সূত্রের প্রধান আলোচ্য বিষয় প্রমাণ। তাঁহার মতে প্রমাণ চার প্রকার। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান এবং শব্দ। তাঁহার প্রদত্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণ এই :—

“ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানমব্যপদেশ্যমব্যভিচারি ব্যব-সায়াত্মং প্রত্যক্ষম্।”

লক্ষণটির প্রথম অংশ বলে, ইন্দ্রিয়ের সহিত অর্থের সন্নিকর্ষ জন্য যে জ্ঞান তাহাই প্রত্যক্ষ। সুতরাং ইন্দ্রিয়ের সহিত অর্থের সন্নিকর্ষ জন্য যে সংবেদন তাহাই ইন্দ্রিয় ব্যাপার জন্য জ্ঞানের করণ—তাহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

সূত্রের প্রথম অংশে যে জ্ঞান শব্দটি আছে, ভাষ্যকারদিগের লিপিতে ইহার দুই প্রকার ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়। এক ব্যাখ্যা অনুসারে জ্ঞান শব্দের অর্থ জ্ঞানের বা উপলব্ধির করণ.

অপর প্রকার ব্যাখ্যা অনুসারে ইহার অর্থ জানা বা উপলব্ধি। জ্ঞান শব্দটির প্রথম প্রকার ব্যাখ্যা অনুসারে সূত্রটি দ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে প্রত্যক্ষ প্রমাণ কি তাহা এবং দ্বিতীয় প্রকার ব্যাখ্যা অনুসারে, ইহা প্রকাশ করে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা অনুভূতি কি তাহা। বলা বাহুল্য যে, প্রথম প্রকারের ব্যাখ্যাই সমীচীন, কেননা গোতম প্রত্যক্ষকে এক প্রকার প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করিয়া প্রত্যক্ষের লক্ষণ কি তাহাই সূত্রে প্রকাশ করিয়াছেন।

সূত্রের প্রথমাংশের অর্থ তাহা হইলে এই দাঁড়াইল যে, ইন্দ্রিয়ের সহিত অর্থ বা বিষয়ের সন্নিকর্ষ জন্য ঐন্দ্রিক জ্ঞান বা উপলব্ধির যে করণ তাহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ইন্দ্রিয়ের সহিত অর্থের সন্নিকর্ষ হইতে উৎপন্ন সংবেদন। ইহাই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অব্যবহিত পূর্ব্বভাবী। ইহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। সংবেদন কথাটিকে ইংরাজীতে বলে sensation এবং সংবেদন জন্য জ্ঞানকে বলে (sensual perception) প্রত্যক্ষ কথাটির আমাদিগের দর্শনে এই দুই অর্থেই ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

একটি বিশেষ মনে রাখিবার বিষয় এই যে, ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষ জন্য যতটুকু সংবেদন বা জ্ঞান তাহাই প্রত্যক্ষ। ইহা কেবল আমাদিগের অর্থের সহিত পরিচয় ঘটায় মাত্র—অর্থটি কি তাহা বলিয়া দেয় না। অর্থটি কি, তাহার জ্ঞান অন্যজ্ঞান জন্য জ্ঞান। সুতরাং প্রত্যক্ষ কি তাহা বাক্যে প্রকাশ করা যায় না। ইহা অব্যপদেশ্য—অনির্ব্বচনীয়; কেবল তাহা নহে, একই অর্থের সহিত সন্নিকর্ষ জন্য সংবেদন বা জ্ঞান সর্ব্ব অবস্থাতেই এক রকম হইবে এবং ইহাতে কোনও সংশয়ের অবকাশ থাকে না। ইহা অব্যভিচারি এবং নিশ্চয়াত্মিক। কথাটি একটি উদাহরণ দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করা যাইতেছে। আমি চক্ষু উন্মিলন করিয়া একটি বস্তু দেখিয়া জানিতে পারিলাম যে, ইহা একটি রজ্জু।

বস্তুটি যে একখণ্ড রজ্জু এই জ্ঞান আমার ইন্দ্রিয় ব্যাপার জন্য জ্ঞান নহে। প্রত্যক্ষ দ্বারা আমি এই মাত্র জানি যে, বস্তুটি একটা কিছু—একটা আকার বা রূপ মাত্র। আমার অজ্ঞাতসারেই অতি-দ্রুত মানসিক ক্রিয়া দ্বারা ইহা যে একখণ্ড রজ্জু তাহা অনুমান করিয়া লইয়াছি। প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞানকে বাক্য দ্বারা বর্ণনা করিতে গেলেই ইহাতে অন্য জ্ঞান জন্য জ্ঞানে জড়াইয়া পড়ে।

এই রজ্জুখণ্ডকে একটু দূর হইতে দেখিয়া আমি ইহাকে সর্প বলিয়া ভ্রম করিলাম। এখন একটি প্রশ্ন হইতে পারে, একই বস্তুর প্রত্যক্ষে যখন ইহাকে একবার রজ্জু এবং একবার সর্প বলিয়া প্রতীতি হয়, তখন প্রত্যক্ষ যে অব্যভিচারি তাহা কিরূপে বলা যাইতে পারে? একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে, কেবল প্রত্যক্ষজনিত যে সংবেদন বা জ্ঞান হইয়াছিল, তাহা উভয় স্থলে একরূপই ছিল। কেবল ইন্দ্রিয় ব্যাপার জন্য যে জ্ঞান ছিল, ইহা এক রকমই ছিল; ইহাতে অন্য জ্ঞান জড়াইয়াছি বলিয়াই ইহা সর্প জ্ঞানের কারণ হইয়াছে। বস্তুটিকে দূর হইতে দেখিয়া যখন ইহা রজ্জু কি সর্প, এইরূপ সন্দেহে দুদোল্যমান হই তখনও এই কথা। রজ্জুজ্ঞান, সর্পজ্ঞান এবং রজ্জু কি সর্প এই সংশয় এই তিন স্থলেই বস্তুটি সম্বন্ধে যে সংবেদন বা ঐন্দ্রিক জ্ঞান তাহা একই রকম, ইহাতে অন্য উপায়ে লব্ধ অন্য জ্ঞান জড়াইয়া ইহাকে একবার রজ্জুজ্ঞানে, একবার সর্পজ্ঞানে এবং একবার রজ্জু না সর্প এই প্রকার সন্দেহযুক্ত জ্ঞানে পরিণত করিয়াছি। সুতরাং যাহা কেবল প্রত্যক্ষ ইহা সংবেদনই হউক বা সংবেদনরূপ করণ জন্য জ্ঞানই হউক তাহা অব্যপদেশ্য অব্যভিচারি এবং ব্যবসায়াত্মক।

তাহা হইলে সমগ্র সূত্রটির অর্থ এই হইল যে, ইন্দ্রিয়ের সহিত অর্থের সন্নিকর্ষ জন্য সংবেদনরূপ অপরোক্ষ জ্ঞানের যে করণ তাহা

প্রত্যক্ষ। যাহা প্রত্যক্ষ তাহা অব্যপদেশ্য, অব্যভিচারি এবং ব্যবসায়াত্মক।

কোন কোন ভাষ্যকার সূত্রটির এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, ইন্দ্রিয়ের সহিত সন্নিকর্ষ জন্য জ্ঞানের যে করণ তাহা যদি অব্যপদেশ্য, অব্যভিচারি এবং ব্যবসায়াত্মক হয়, তবে তাহাকে প্রত্যক্ষ বলে। এই ব্যাখ্যা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, যাহা ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষোৎপন্ন জ্ঞান, তাহাকে অব্যপদেশ্য অব্যভিচারি এবং ব্যবসায়াত্মক হইতেই হইবে। কিন্তু সূত্রের এই প্রকার ব্যাখ্যা হইতে মনে হইতে পারে ঐরূপ জ্ঞান যেন ব্যপদেশ্য, ব্যভিচারি এবং অনিশ্চয়াত্মিকও হইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, অব্যপদেশ্য অব্যভিচারি এবং ব্যবসায়াত্মক এই সকল কথা প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণের অপরিহার্য্য অংশ নহে। এই সকল কথা ছাড়িয়া দিলেও লক্ষণটি অতিব্যাপ্তি দোষ দুষ্ট হইবে না। পরবর্ত্তী কালের নৈয়ায়িকগণ তাঁহাদিগের প্রদত্ত প্রত্যক্ষের লক্ষণে এই সকল বিশেষণ পরিত্যাগই করিয়াছেন। অবশ্য একটি প্রশ্ন মনে উদয় হইতে পারে যে, যদি এই সকল কথা সূত্রে যোজনা করিবার কোনও প্রয়োজন না থাকে, তবে এই সকল কথার উল্লেখ করিয়া সূত্রের কলেবর বৃদ্ধি করা হইল কেন? সূত্রের লক্ষণত এই যে, ইহাতে যথাসম্ভব অল্প অক্ষর থাকিবে—

"স্বল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবৎ বিশ্বতোমুখম্।
অস্তোভমনবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদোবিদুঃ॥"

প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণে গোতম তিনটি অনাবশ্যকীয় এবং অপেক্ষাকৃত সুদীর্ঘ শব্দ যোজনা করিয়া এই বিধি লঙ্ঘন করিলেন কেন? আপত্তিটীর উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, শব্দ তিনটি অপরিহার্য্য না হইলেও যে বিনা উদ্দেশ্যে সূত্রে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে

তাহা নহে। যে সকল কারণে অন্য উপায়লব্ধ জ্ঞান প্রত্যক্ষের সহিত জড়িত হইয়া ভ্রম জন্মাইতে পারে তাহা সর্ব্বদা চক্ষুর সামনে ধরিয়া দিবার জন্যই সূত্রে এই তিনটি শব্দ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সূত্রকারগণ মাঝে মাঝে এইরূপ করিয়া থাকেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ সাংখ্যদর্শনের প্রথম সূত্রটি উল্লেখ করা যাইতে পারে। সূত্রটি বলে, ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই পুরুষার্থ। যখন, দুঃখ মাত্রই আধ্যাত্মিক, বা আধিভৌতিক বা আধিদৈবিক, তখন সূত্রে ত্রিবিধ কথার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। দুঃখ মাত্রই যে এই তিন-প্রকারের এক প্রকার ইহা সত্য। তথাপি এই কথাটি সর্ব্বদা মনে থাকে না বলিয়া সূত্রকার পুরুষার্থ কি, ইহা বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে এই কথাটি সূত্রে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

নব্য নৈয়ায়িকদিগের মধ্যে কেহ কেহ মনে করেন যে, সূত্রে প্রত্যক্ষের যে লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে অব্যাপ্তি দোষ আছে। ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ হয় অথচ ইহা ইন্দ্রিয় ব্যাপার জন্য জ্ঞান নহে সুতরাং লক্ষণটি ঈশ্বর প্রত্যক্ষ পর্য্যন্ত পৌছায় না। এই কথা সত্য যে, ঈশ্বরের অপরোক্ষ জ্ঞান ইন্দ্রিয় ব্যাপার জন্য জ্ঞান নহে; সুতরাং গোতম প্রত্যক্ষের যে লক্ষণ দিয়াছেন, তাহা ঈশ্বর প্রত্যক্ষে প্রযোজ্য নহে। তবে একটি মনে রাখিবার বিষয় এই যে, গোতমের মতে ঈশ্বর সাক্ষাৎ অনুভূতির বিষয় নহে। প্রত্যক্ষ ব্যতীত অন্য কোনও প্রকারে যে অপরোক্ষানুভূতি হইতে পারে তাহা তিনি স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুমেয়—জগতের বৈচিত্রপূর্ণ নির্ম্মাণ কৌশল দেখিয়া আমরা ইহার রচয়িতা যে একজন সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর আছেন তাহা অনুমান করিয়া লই। ঈশ্বর অনুমানের বিষয় অপরোক্ষানুভূতির বিষয় নহে। সুতরাং এই দার্শনিক মতের সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষের লক্ষণের কোন বিরোধ নাই।

নব্য নৈয়ায়িকদিগের মধ্যে কেহ কেহ প্রত্যক্ষ কথা দ্বারা লৌকিক (Sensual) এবং অলৌকিক (intuitional or Transcendental) সর্ব্বপ্রকার অপরোক্ষানুভূতিই লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে অপরোক্ষ জ্ঞানের লৌকিক উপায়, ইন্দ্রিয়ের সহিত অর্থ সন্নিকর্ষ জন্য সংবেদন এবং অলৌকিক উপায়, ধ্যান বা সমাধি। এই কথার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহারা প্রত্যক্ষের লক্ষণে অনেকটা রূপান্তর ঘটাইয়াছেন। নিম্নে নব্য নৈয়ায়িকদিগের প্রদত্ত কয়েকটি লক্ষণ উল্লেখ করা যাইতেছে।

"সাক্ষাৎধীঃ প্রত্যক্ষম্"। (তত্বচিন্তামণি) ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণ নহে। ইহা প্রত্যক্ষ প্রমার লক্ষণ এবং ইহা দ্বারা সকল প্রকার অপরোক্ষানুভূতিই লক্ষিত হয়।

মায়াবাদীদিগের প্রদত্ত প্রত্যক্ষের একটি লক্ষণ এই :—"অন্তঃকরণ বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যেন বিষয় স্ফুরণং প্রত্যক্ষম্।" তাহাদিগের মতে চৈতন্য, বিষয়িগত, বুদ্ধিগত এবং বিষয়গত। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সন্নিকর্ষ হইলেই বুদ্ধিগত চৈতন্য বিষয়গত চৈতন্যের সহিত যোগ হইয়া তদাকার প্রাপ্ত হয়। এই তদাকার প্রাপ্তি অর্থাৎ বুদ্ধি চৈতন্য এবং বিষয় চৈতন্যের একরূপত্বই প্রত্যক্ষের প্রমাণ এবং তজ্জনিত বিষয় স্ফুরণ প্রত্যক্ষ জ্ঞান। লক্ষণটি যে ভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে তাহাতে ইহাকে প্রত্যক্ষজ্ঞানেরই লক্ষণ বলিয়া মনে হইবে।

বৌদ্ধদিগের প্রদত্ত একটি লক্ষণ এই "যৎকিঞ্চিৎ অর্থস্য সাক্ষাৎ কারি জ্ঞানং তৎ প্রত্যক্ষম্।" এই লক্ষণটির বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে স্পষ্টভাবাই ইন্দ্রিয় ব্যাপার জন্য যতটুকু জ্ঞান কেবল ততটুকুকেই প্রত্যক্ষ বলা হইয়াছে। প্রত্যক্ষ আমাদিগকে অর্থ সম্বন্ধে এই মাত্র বলে যে, ইহা একটা কিছু (It is a mere

knowledge of acquaintance)। ইহা কি, প্রত্যক্ষ তাহা বলে না। ইহা কি, তাহা জানা অন্য জ্ঞানজন্য জ্ঞান। এই কথাটাই নাস্তিক দার্শনিকগণ প্রকাশ করিয়াছেন এইরূপে:— "বৈশিষ্টানবগাহি জ্ঞানং প্রত্যক্ষম্।" জ্ঞানম্ কথাটি দ্বারা জ্ঞানকরণম্ মনে করিলে লক্ষণ দুইটি প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণ, আর জানা মনে করিলে ইহারা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের লক্ষণ।

"জ্ঞানাকরণকং জ্ঞানং প্রত্যক্ষম্।" এই লক্ষণটি অল্প কথায় অতি সুন্দর। অন্য জ্ঞান যে জ্ঞানের করণ নহে তাহা প্রত্যক্ষ। ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার অপরোক্ষ জ্ঞান লক্ষিত হয়।

"সাক্ষাৎরূপ প্রমাকরণং প্রত্যক্ষম্" (ন্যায় মঞ্জুরী) এইটি স্পষ্ট ভাষাই সর্ব্বপ্রকার অপরোক্ষ জ্ঞানের প্রমাণের লক্ষণ। সর্ব্বপ্রকার অপরোক্ষ জ্ঞানের যাহা করণ বা প্রমাণ তাহাই প্রত্যক্ষ।

"নির্ব্বিকল্প জ্ঞানে ইন্দ্রিয়ং করণম্। সবিকল্প জ্ঞানে ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষ নির্ব্বিকল্প জ্ঞান দ্বারা করণম্" (সিদ্ধান্ত চন্দ্রোদয়)। এই লক্ষণটি গোতম এবং কনাদসূত্রের প্রত্যক্ষ লক্ষণের একটি অতি সুন্দর ব্যাখ্যা। প্রত্যেক ইন্দ্রিয় ব্যাপার জন্য জ্ঞানের তিনটি পারম্পারিক অবস্থা থাকে। (১) ইন্দ্রিয় (২) ইন্দ্রিয়ের সহিত অর্থের সন্নিকর্ষজন্য সংবেদন (sensation) (৩) এই সংবেদন জন্য অনুভূতি (perception)। লক্ষণটী বলে যে, সংবেদনের করণ ইন্দ্রিয়, অনুভূতির করণ সংবেদন এবং ইহাই ইন্দ্রিয়ব্যাপারের জন্য অনুভূতির প্রমাণ বা প্রত্যক্ষ। বৈশেষিকদিগের মতে সংবেদনকে বলা হইয়াছে নির্ব্বিকল্প প্রত্যক্ষ এবং সংবেদন জন্য অনুভূতিকে বলা হইয়াছে সবিকল্প প্রত্যক্ষ।

নব্যন্যায় মতে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের শ্রেণী বিভাগ এইরূপ—

ইন্দ্রিয় ব্যাপার নিরপেক্ষভাবে যে অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ হয় তাহা অলৌকিক প্রত্যক্ষ। নৈয়ায়িকগণ মনে করেন যে সামান্যের যে জ্ঞান, যেমন গোত্ব, তাহা একপ্রকার অলৌকিক প্রত্যক্ষ। ইহার নাম সামান্য লক্ষণ জন্য অলৌকিক প্রত্যক্ষ।

এই প্রকার সামান্যের অলৌকিক প্রত্যক্ষ স্বীকার না করিলে ব্যাপ্তিগ্রহ অনুমান সম্ভব হয় না। কয়েকটি গো দেখিয়া যখন আমরা নিরূপণ করি যে গো মাত্রই গলকম্বল বিশিষ্ট তখন আমরা এই বলিতে চাই যে গো মাত্রই অর্থাৎ যে সকল গো এখন আছে, যাহারা অতিতে ছিল, যাহারা ভবিষ্যতে থাকিবে, যাহাদিগকে আমরা দেখিয়াছি, যাহাদিগকে দেখি নাই, তাহারা সকলই গলকম্বল বিশিষ্ট। ইহা হয় কি প্রকারে? সমগ্র গো-জাতির প্রত্যক্ষ না হইলে এই প্রকার ব্যাপ্তিগ্রহ ত সম্ভব হয় না। সুতরাং স্বীকার করিতেই হইবে যে গোত্ব বা গো-জাতির প্রত্যক্ষ করিয়াই আমরা এই প্রকার ব্যাপ্তিগ্রহানুমান করিয়া থাকি। এই প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয় ব্যাপার জন্য প্রত্যক্ষ নহে, ইহা ইন্দ্রিয় নিরপেক্ষ অলৌকিক প্রত্যক্ষ। ইহাই সামান্য লক্ষণ অলৌকিক প্রত্যক্ষ।

নৈয়ায়িকগণ জ্ঞান লক্ষণ অলৌকিক প্রত্যক্ষ দ্বারা কি বুঝাইতে চাহেন তাহাদিগের প্রদত্ত কয়েকটি উদাহরণ দ্বারা তাহার একটু আভাস দিবার চেষ্টা করা যাইতেছে। একটি উদাহরণ এই ঃ— আমরা একবার একটি চন্দন বৃক্ষের রূপ এবং সৌরভের সাক্ষাৎ অনুভূতি লাভ করিলে আমাদিগের জ্ঞানের মধ্যে এই রূপ এবং সৌরভ এরূপভাবে জড়িত থাকে যে পরে যদি দূর হইতেও কোন চন্দনবৃক্ষ দেখিতে পাই তবে ইহার রূপের সঙ্গে সঙ্গে ইহার সৌরভের সাক্ষাৎ অনুভূতি লাভ করি। দর্শন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বিষয়েরও অনুভূতি হয়; চন্দনবৃক্ষের সহিত ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ না হওয়া সত্ত্বেও ইহার সৌরভের সাক্ষাৎ অনুভূতি হয়। ইহা হয় কি প্রকারে? ইহার জন্য অলৌকিক প্রত্যক্ষ স্বীকার করিতে হয়। ইহাই জ্ঞানলক্ষণ অলৌকিক প্রত্যক্ষ।

কেহ কেহ বলেন, যখন আমরা বলি বরফ খণ্ডকে শীতল দেখায়, দুর্ব্বাদলকে কোমল দেখায়, তখন নিশ্চয়ই আমরা বরফ এবং দুর্ব্বাদলকে দেখিয়াই তাহাদিগের শীতলত্ব এবং কোমলত্বের অনুভূতি লাভ করি। দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্যেই স্পর্শেন্দ্রিয়ের বিষয়েরও অনুভূতি লাভ করি। ইহা হয় কি প্রকারে? ইহাই জ্ঞানলক্ষণ অলৌকিক প্রত্যক্ষ।

আর এক কথা এই যে, এই প্রকার অলৌকিক প্রত্যক্ষ স্বীকার না করিলে শুক্তিতে যে রজত জ্ঞান হয় ইহার ব্যাখ্যা করা যায় না। রজতের সঙ্গে দর্শনেন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ না হওয়া সত্ত্বেও রজতের রূপের অনুভূতি হইল। এই প্রকার জ্ঞানও অলৌকিক জ্ঞানলক্ষণ প্রত্যক্ষ।

এই সকল ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে কথা এই যে, ইহারা সকলই কল্পনাপ্রসূত। চন্দন বৃক্ষ দেখিয়াই ইহার সৌরভের অনুভূতি হয়, বরফ খণ্ড দেখিয়াই ইহার শীতলত্বের এবং দুর্ব্বাদল দেখিয়াই

কোমলত্বের সাক্ষাৎ অনুভূতি হয় বলিয়া যে বলা হইয়াছে এই কথাই সত্য নহে। দূর হইতে চন্দন বৃক্ষ দেখিয়া কেহই ইহার সৌরভের অনুভূতি লাভ করে না। পূর্ব্বে শতবার দর্শন এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সহায়ে ইহার রূপ এবং সৌরভের অনুভূতি লাভ করিয়া থাকিলেও কেহ কেবল মাত্র চন্দন বৃক্ষ দেখিয়াই ইহার সৌরভের সাক্ষাৎ অনুভূতি লাভ করিতে পারে না। বরফ খণ্ড শীতল দেখায়, দুর্ব্বাদল কোমল দেখায় বলিবার সময় কেহ বরফের শীতলত্ব বা দুর্ব্বাদলের কোমলত্ব অনুভব করে না। মনে হইতে পারে যেন চন্দন বৃক্ষ, বরফ এবং দুর্ব্বাদলে যথাক্রমে সৌরভ, শীতলত্ব এবং কোমলত্ব অনুভব করিলাম। এইরূপ একটা ভাব মনে করা এক কথা এবং সাক্ষাৎ অনুভূতি অন্য কথা। সুতরাং যে ব্যাখ্যা কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা যে সুব্যাখ্যা নহে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

শুক্তি দেখিয়া যে আমরা রজতের অনুভূতি লাভ করি এই কথাও ঠিক নহে। দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা আমরা শুক্তির প্রত্যক্ষ করি না, রজতেরও প্রত্যক্ষ করি না। আমরা প্রত্যক্ষ করি একটা ব্যাপার, যাহা শুক্তি এবং রজতের সাধারণ রূপ। ইহা হইতে ভ্রমাত্মক অনুমাণ করিয়া মনে করি যেন রজত দেখিলাম। এই বিষয়ে, প্রত্যক্ষ প্রমাণ যে অব্যপদেশ্য, অব্যভিচারি এবং ব্যবসায়াত্মক তাহার আলোচনায়, বিশেষ ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে অলৌকিক প্রত্যক্ষের শ্রেণী বিভাগকারী ব্যাখ্যাকারগণ জ্ঞানলক্ষণ অলৌকিক প্রত্যক্ষ দ্বারা যাহাই মনে করিয়া থাকুন না কেন, তাঁহাদিগের একটি ব্যাখ্যাও সমীচীন নহে। ইহারা কল্পনাপ্রসূত।

যোগজ লক্ষণ অলৌকিক সন্নিকর্ষই প্রকৃত অলৌকিক সন্নিকর্ষ। কোনোও বস্তুর ধ্যানের দ্বারা ইহার যে অপরোক্ষ অনুভূতি হয়,

তাহাই যোগজ অলৌকিক সন্নিকর্ষের ফল। ধ্যানের দ্বারা যে ধ্যেয় বস্তুর সাক্ষাৎ অনুভূতি লাভ করা যায়, তাহা যে কেবল ভারতীয় ঋষিদিগের কথা তাহা নহে, বর্ত্তমান যুগের ইয়োরোপীয় দার্শনিকদিগের মধ্যেও কাহারো কাহারো এই মত। ফরাসী-দেশীয় দার্শনিক রোসো বলেন যে, কেবল ধ্যানের দ্বারাই সত্যের সাক্ষাৎ অনুভূতি লাভ হয়। তিনি আরও বলেন যে, আমাদিগের ইন্দ্রিয় ব্যাপার জন্য প্রত্যক্ষ দ্বারা বস্তুর সঠিক তত্ত্ব ত জানা যায়ই না বরং ইহা দ্বারা সত্যনিরূপণের জন্য বাধাই সৃষ্টি করা হয়। জার্ম্মেন দার্শনিক হেগেল বলেন, তৈলধারাবৎ ধ্যানকে প্রবাহিত হইতে দেওয়াই পারমার্থিক তত্ত্ব সাক্ষাৎ করিবার একমাত্র উপায়।

ধ্যান বা সমাধি দ্বারা যাহারা অলৌকিক প্রত্যক্ষ লাভ করিয়াছেন নৈয়ায়িকগণ তাহাদিগকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন—যুক্ত এবং যুঞ্জান। যোগ অভ্যাস দ্বারা বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত থাকা যাহার চিত্তের স্বাভাবিক অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে, ধ্যান ব্যতীতও সর্ব্বপ্রকার প্রকৃত জ্ঞান অপরোক্ষ ভাবেই তাহার মনে ভাসমান থাকে। বিনা ধ্যানেই বস্তুর সহিত তাহার মনের অলৌকিক সন্নিকর্ষ ঘটে। ইহাই যুক্ত যোগীর লক্ষণ। যাঁহার এখনও ঐ অবস্থা লাভ হয় নাই, কিন্তু যখনই ধ্যানে মগ্ন হয়েন তখনই সেই অবস্থা লাভ করেন তিনি যুঞ্জান যোগী। বৈদান্তিকগণ যোগজ প্রত্যক্ষকেই একমাত্র অলৌকিক প্রত্যক্ষ বলিয়া স্বীকার করেন। তাঁহাদিগের মতে সামান্য লক্ষণ বা জ্ঞান লক্ষণ অলৌকিক প্রত্যক্ষ কল্পনাপ্রসূত। প্রকৃতপক্ষে এইরূপ কোন প্রত্যক্ষ হয় না।

সাংখ্য সূত্রে প্রত্যক্ষের লক্ষণ এই :—

যৎ সমবন্ধং সৎ তদাকারোল্লেখি বিজ্ঞানং প্রত্যক্ষম্।

যে বস্তু প্রকৃতপক্ষে সৎ অর্থাৎ অস্তিত্ববিশিষ্ট তাহার সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ ঘটিলে বুদ্ধি তদাকার প্রাপ্ত হইয়া যে বিজ্ঞান

জন্মায় তাহা প্রত্যক্ষ। এই সূত্র অনুসারেও বিজ্ঞান শব্দ দ্বারা জ্ঞান বা জানার করণ লক্ষিত হইলে ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণ এবং জ্ঞান বা জানা লক্ষিত হইলে ইহা প্রত্যক্ষ প্রমার লক্ষণ।

পূর্ব্বমীমাংসা মতে প্রত্যক্ষের লক্ষণ এই :—

সৎ সংপ্রয়োগে পুরুষস্যেন্দ্রিয়ানাং বুদ্ধিজন্ম তৎপ্রত্যক্ষম-নিমিত্তং বর্ত্তমানোপলম্ভনত্বাৎ।

বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ বা যোগ হইলে যে জ্ঞান জন্মে তাহা প্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষ বর্ত্তমানের বিষয়, অতএব ইহা অনিমিত্ত অর্থাৎ পূর্ব্বলব্ধ অন্য জ্ঞান জন্য নহে।

কোন কোন ভাষ্যকার অনিমিত্ত শব্দের অর্থ করিয়াছেন যে, ধর্ম্মলাভের জন্য ইহা নিষ্প্রয়োজনীয়, কেননা ইহা ধর্ম্ম বিষয়ক জ্ঞান উৎপাদন করিতে পারে না, যেহেতু ইহা বর্ত্তমানের বিষয়। ধর্ম্মফল বর্ত্তমানের বিষয় নহে। অনিমিত্ত শব্দের এইরূপ কষ্টসাধ্য ব্যাখ্যা সমীচীন বলিয়া মনে করি না।

অনুমান

সত্য নিরূপণের জন্য প্রত্যক্ষই মুখ্য উপায়। কিন্তু অনেক সময়ে প্রত্যক্ষ দ্বারা জ্ঞান লাভের সম্ভাবনা থাকে না। তখন প্রত্যক্ষ সাপেক্ষ অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হয়। এই সকল সত্য নিরূপণের গৌণ বা অমুখ্য উপায়। প্রত্যক্ষ ব্যতীত আর যত উপায় আছে, তাহারা সকলই অমুখ্য বা গৌণ উপায়। উহাদিগের মধ্যে অনুমান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

অনুমা শব্দের অর্থ পশ্চাৎ জ্ঞান অর্থাৎ একটা বস্তু প্রত্যক্ষ করিয়া অপর একটা বস্তুর অস্তিত্বের জ্ঞানই অনুমা বা অনুমিতি। যাহা অনুমা বা অনুমিতির করণ তাহাই অনুমান। এই করণটি

কি, তাহা জানিতে হইলে, দার্শনিকগণ ব্যাপ্তি শব্দ দ্বারা কি লক্ষ্য করেন, তাহার সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। গোতমসূত্রে ব্যাপ্তির কোনও লক্ষণ দেওয়া হয় নাই। কিন্তু প্রত্যেক ন্যায়ের (syllogism এর) মধ্যে যে অন্ততঃ একটি ব্যাপ্তি বাক্য থাকা অপরিহার্য্য প্রকারন্তরে তাহার উল্লেখ আছে। সাংখ্যসূত্রে ব্যাপ্তির যে লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে সেইটি অতি সুন্দর এবং সহজ বোধ্য। লক্ষণটি এই :—

"নিয়ত ধর্ম্ম সাহিত্য মুভয়োরেকতরস্য বা ব্যাপ্তি।"

দুইটি বস্তুর মধ্যে নিয়ত সাহিত্য সম্বন্ধকে বলে ব্যাপ্তি। নিয়ত সাহচর্য্যের অর্থ এই যে, অন্য অবস্থা যাহাই হউক না কেন বস্তু দুইটির একটি নিয়তই অপরটির সহচর। এই সাহচর্য্য পরস্পর পরস্পরের সহিত হইতে পারে অথবা কেবল একটির অপরটির সহিত হইতে পারে। ক এবং খ এর মধ্যে নিয়ত সাহচর্য্য সম্বন্ধ আছে। ইহার অর্থ এই হইতে পারে, যে স্থলে ক আছে সেই স্থলে খও আছে এবং যে স্থলে খ আছে সেই স্থলে কও আছে, অথবা যে স্থলে ক আছে সেই স্থলে খ আছে কিন্তু যে স্থলে খ আছে সেই স্থলে ক আছে কি নাই তাহা বলা যায় না, থাকিতেও পারে না থাকিতেও পারে। প্রথম প্রকার অর্থাৎ পারস্পারিক নিয়ত সাহচর্য্যকে বলে সমব্যাপ্তি এবং দ্বিতীয় প্রকার সাহচর্য্যকে বলে বিষমব্যাপ্তি। একটি সরল রৈখিক ক্ষেত্রের তিন বাহু বিশিষ্টত্ব এবং তিন কোণবিশিষ্টত্বের মধ্যে যে নিয়ত সাহচর্য্য, তাহা সমব্যাপ্তি। কোনও সরল রৈখিক ক্ষেত্রের তিন বাহু থাকিলে তাহার তিন কোণ থাকিবেই এবং তিন কোণ থাকিলে তিন বাহু থাকিবেই থাকিবে। ত্রিকোণত্ব ত্রিবাহুত্বের নিয়ত সহচর এবং ত্রিবাহুত্ব ত্রিকোণত্বের নিয়ত সহচর। বর্গক্ষেত্র ও চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের মধ্যে বিষমব্যাপ্তি। বর্গক্ষেত্র মাত্রই চতুর্ভুজ

ক্ষেত্র কিন্তু চতুর্ভুজ ক্ষেত্র মাত্রই বর্গক্ষেত্র নহে। কেননা একটি চতুর্ভুজ বর্গক্ষেত্র হইতেও পারে কিম্বা নাও হইতে পারে। দ্বিখণ্ডিত খুর বিশিষ্টত্ব এবং চর্ব্বিত চর্ব্বণ করার শক্তি বিশিষ্টত্বের মধ্যে সমব্যাপ্তি সম্বন্ধ। যে জন্তুর পায়ের খুর দ্বিখণ্ডিত সেই জন্তু চর্ব্বিত চর্ব্বণ করে এবং যে জন্তু চর্ব্বিত চর্ব্বণ করে সেই জন্তুর পায়ের খুর দ্বিখণ্ডিত। মনুষ্যত্ব এবং স্তন্যপায়িত্বের মধ্যে বিষম-ব্যাপ্তি। মনুষ্যমাত্রই স্তন্যপায়ী কিন্তু স্তন্যপায়ী মাত্রই মনুষ্য নহে।

নিয়ত সাহচর্য্যকে আর এক ভাবেও বিশ্লেষণ করা যায়। সম্বন্ধটি পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধ (relation sequence)ও হইতে পারে অথবা সহাস্তিত্ব জ্ঞাপক সম্বন্ধ (relation coexistence)ও হইতে পারে। পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধ জ্ঞাপক ব্যাপ্তিতে পদার্থ দুইটির একটি নিয়তই অপরটির পূর্ব্বে বা পরে থাকে এবং সহাস্তিত্ব প্রকাশক ব্যাপ্তিতে ইহারা এক আধারে একই সময় বর্ত্তমান থাকে। বহ্নি এবং ধূমের মধ্যে পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধ প্রকাশক ব্যাপ্তি। ত্রিভুজত্ব এবং ত্রিকোণ বিশিষ্টত্বের মধ্যে সহাস্তিত্ব প্রকাশক ব্যাপ্তি। পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধ প্রকাশক ব্যাপ্তির মধ্যেও সম এবং বিষম ব্যাপ্তি আছে। বহ্নি এবং ধূমের মধ্যেও পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধ প্রকাশক বিষম ব্যাপ্তি। বহ্নি নিয়তই ধূমের পূর্ব্বে থাকে কিন্তু ধূম নিয়তই বহ্নির পূর্ব্বে বা পরে নাও থাকিতে পারে। জন্ম এবং মৃত্যুর মধ্যে সম্বন্ধ এই যে জন্মের পর মৃত্যু আছেই আছে এবং মৃত্যুরপূর্ব্বে জন্ম থাকেই থাকে। ইহা একটি পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধ প্রকাশক সমব্যাপ্তির দৃষ্টান্ত। গোতম প্রদত্ত অনুমানের লক্ষণের পারিভাষিক নামের অনুকরণে আমরা ব্যাপ্তিকে যথাক্রমে পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ এবং সামান্যত দৃষ্ট আখ্যা দিতে পারি।

পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধ প্রকাশক ব্যাপ্তি এবং কার্য্য কারণ সম্বন্ধ একই কথা। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, নিয়তই অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে

অন্য নিরপেক্ষ ভাবেই যাহা কার্য্যের পূর্ব্বে থাকে তাহাই কার্য্যের কারণ এবং কারণ উপস্থিত থাকিলে কার্য্য ঘটিবেই ঘটিবে। কার্য্য কারণরূপ সম্বন্ধ বিশিষ্ট ব্যাপ্তি নিরূপণই বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রধান লক্ষ্য।

যে প্রণালীর যুক্তি দ্বারা ব্যাপ্তি নিরূপণ করা হয় তাহাকে বলে ব্যাপ্তিগ্রহ। ইংরেজীতে ব্যাপ্তি গ্রহকে বলা হয় Induction.

ব্যাপ্তি নিরূপণের উপায় হইয়াছে ভূয়োদর্শন বা পর্য্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষণ। প্রাকৃতিক ব্যাপার সকল লক্ষ্য করিয়া যদি দেখা যায় দুইটি ব্যাপার এইরূপ সম্বন্ধযুক্ত যে, যে স্থলে একটি আছে বা ঘটে সেই স্থলে অপরটি আছে বা ঘটেই তবে মনে করা যাইতে পারে যে ব্যাপার দুইটির মধ্যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ আছে। ভূয়োদর্শনই এই প্রকার ব্যাপ্তি নিরূপণ করিবার উপায়।

অনেক সময় কৃত্রিম উপায়ে সংগৃহীত ঘটনানিচয় হইতে কি ঘটে তাহা লক্ষ্য করিয়া যদি দেখা যায় যে একই প্রকারের ঘটনা-নিচয় হইতে তাহাদিগের কার্য্যস্বরূপ একই প্রকার ঘটনাই ঘটে, তবে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হয় যে, তাহাদিগের মধ্যে পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধ প্রকাশক ব্যাপ্তি বর্ত্তমান আছে। এই প্রকার ব্যাপ্তি বা কার্য্য কারণ সম্বন্ধ নিরূপণ করার উপায়কে পর্য্যবেক্ষণ না বলিয়া সাধারণতঃ বলা হয় পরীক্ষণ (Experiment)। সূর্য্যের দ্বারা জল শুকাইয়া যাইতে দেখিলে আমরা মনে করি সূর্য্যের উত্তাপ জলকে বাষ্পাকারে পরিণত করে। ইহা পর্য্যবেক্ষণ। কোন হাড়িতে জল রাখিয়া ইহাকে উত্তপ্ত করিলেও দেখিতে পাই জল বাষ্পাকার ধারণ করে। ইহা পরীক্ষণ। বৈজ্ঞানিকগণ পর্য্যবেক্ষণ অপেক্ষা পরীক্ষণ দ্বারাই অনেক তত্ত্ব নিরূপণ করিরা থাকেন। যে স্থলে পরীক্ষণ সম্ভব নহে সেই স্থলে পর্য্যবেক্ষণই ব্যাপ্তি নিরূপণের একমাত্র উপায়। জ্যোতির্ব্বিদগণ চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদির গতি

পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহাদিগের গতির নিয়মাদি নিরূপণ করিয়াছেন। ভূ-তত্ত্ববিদ্, প্রাণীতত্ত্ববিদ্ ও উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ পাথরের, প্রাণীর ও উদ্ভিদের অবস্থাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অনেক সত্য নিরূপণ করিয়া থাকেন। প্রস্তর, প্রাণী কিম্বা উদ্ভিদে যে সকল স্বাভাবিক পরিবর্ত্তন ঘটে, সেই সকল ঘটাইবার ক্ষমতা মানুষের নাই। এই সকল স্থলে পরীক্ষণ অসম্ভব। সুতরাং এই সকল স্থলে ব্যাপ্তি নিরূপণের জন্য পর্য্যবেক্ষণই একমাত্র উপায়। মোটের উপর এই বলা যাইতে পারে যে, যে সকল স্থলে কার্য্য হইতে কারণ নিরূপণ করিতে হয় সেই সকল স্থলে পর্য্যবেক্ষণই আমাদিগের প্রধান সম্বল। কিন্তু কারণ হইতে কার্য্য নিরূপণের জন্য অনেক সময় পর্য্যবেক্ষণ অপেক্ষা পরীক্ষণ অধিকতর কার্য্যকরী।

আর এক ভাবেও ব্যাপ্তি নিরূপণের প্রণালীর শ্রেণী বিভাগ করা হইয়া থাকে। যদি ভিন্ন ভিন্ন স্থলে দুইটি পদার্থকে পর্য্যবেক্ষণ করিলে এইরূপ দেখা যায় যে, যে স্থলে একটি আছে সেই স্থলে অপরটিও থাকে, তবে মনে করা যাইতে পারে যে, পদার্থদ্বয়ের মধ্যে নিয়ত সাহচর্য্য বা ব্যাপ্তি সম্বন্ধ আছে। এই উপায়ে ব্যাপ্তি নিরূপণকে বলা হয় অন্বয়ীপ্রণালী এবং নিরূপিত ব্যাপ্তির নাম অন্বয়ীব্যাপ্তি। দুইটি পদার্থ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন স্থান লক্ষ্য করিয়া যদি এইরূপ দেখা যায়, যে স্থলে তাহাদিগের একটি অনুপস্থিত সেই স্থলে অপরটিও অনুপস্থিত, তবে এইরূপ মনে করা যাইতে পারে যে, পদার্থ দুইটি ব্যাপ্তি সম্বন্ধ বিশিষ্ট। এই প্রণালীর দ্বারা ব্যাপ্তি নিরূপণকে বলা হয় ব্যতিরেকী প্রণালী এবং নিরূপিত ব্যাপ্তির নাম ব্যতিরেকী ব্যাপ্তি। যদি দুইটি পদার্থের পরীক্ষণ বা পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা এইরূপ দেখা যায় যে, যে স্থলে একটি আছে সেই স্থলে অপরটিও আছে এবং যে স্থলে শেষোক্তটি নাই সেই স্থলে প্রথমোক্তটিও নাই (যেমন ধূম এবং বহ্নি—যে স্থলে ধূম আছে

সেই স্থলে বহ্নিও আছে এবং যে স্থলে বহ্নি নাই সেই স্থলে ধূমও নাই) তবে এইরূপ পর্য্যবেক্ষণের ফল স্বরূপ মনে করা যাইতে পারে যে, পদার্থদ্বয় ব্যাপ্তি সম্বন্ধ বিশিষ্ট। এই প্রণালীর নাম অন্বয়ীব্যতিরেকী প্রণালী, ব্যাপ্তির নাম অন্বয়ীব্যতিরেকী ব্যাপ্তি।

একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, ব্যাপ্তি নিরূপণের প্রণালী ভেদেই ব্যাপ্তি সকলকে বলা হয় অন্বয়ীব্যাপ্তি, ব্যতিরেকী ব্যপ্তি এবং অন্বয়ীব্যতিরেকী ব্যাপ্তি। এই শ্রেণী বিভাগ ব্যাপ্তির অর্থের অর্থাৎ সাহচর্য্যের প্রকারভেদ জন্য বিভাগ নহে।

উক্ত হইয়াছে প্রত্যেক ব্যাপ্তির মধ্যে একটি পদার্থ অপর একটি পদার্থের নিয়ত সহচর। যেটি সহচর সেইটিকে বলা হয় ব্যাপক এবং যেটির সহচর সেইটিকে বলা হয় ব্যাপ্য। সুতরাং যে স্থলে ব্যাপ্য আছে সেই স্থলে ইহার সঙ্গে সঙ্গে বা অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে ব্যাপক থাকেই থাকে। যে স্থলে ব্যাপক আছে সেই স্থলে ব্যাপ্য থাকিতেও পারে কিম্বা নাও থাকিতে পারে, যেমন ধূম এবং বহ্নি।

প্রত্যেক ব্যাপ্তিই একটি ব্যাপক বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা হয়। ব্যাপক বাক্যের অর্থ এই যে, ইহাতে উদ্দেশ্য পদ দ্বারা লক্ষিত প্রত্যেক ব্যক্তি সম্বন্ধেই বিধেয় পদের অন্বয় বা নিষেধ করা হয়। যেমন সকল ধূমবান পদার্থই বহ্নিমান। সকল মানুষই মরণশীল। সকল ধাতুই উত্তপ্ত হইলে আয়তনে বাড়ে। ইত্যাদি।

পরে দেখান হইবে যে যখন ব্যাপ্তি বাক্য ন্যায়েতে প্রয়োগ করা হয় তখন ব্যাপ্য এবং ব্যাপককে যথাক্রমে বলা হয় হেতু এবং সাধ্য। নব্য নৈয়ায়িকদিগের মধ্যে কেহ কেহ ব্যাপ্তির লক্ষণ প্রকাশ করিতে যাইয়া ব্যাপ্য, ব্যাপক শব্দদ্বয়ের পরিবর্ত্তে হেতু, সাধ্য এই দুইটি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহাদিগের প্রদত্ত

একটি লক্ষণ এই :—"হেতুমন্নিষ্ঠা ব্যাপ্তি"। যাহা হেতুমৎ তাহাতে সাধ্যের নিয়ত স্থিতির নাম ব্যাপ্তি। হেতু এবং সাধ্য প্রভৃতি পদ ন্যায়বাক্যে ব্যবহার করা হয়। ব্যাপ্তি জ্ঞানের জন্য হেতু এবং সাধ্যের জ্ঞান অপরিহার্য্য নহে। হেতুই বা কি এবং সাধ্যই বা কি ইহা না জানিয়াও ব্যাপ্তি কি তাহা জানা যাইতে পারে। কিন্তু ব্যাপ্তি জ্ঞান ব্যতীত হেতু সাধ্যের সম্বন্ধ জ্ঞান লাভ করা যায় না। সুতরাং ব্যাপ্তি কি ইহা বুঝাইবার জন্য হেতু ও সাধ্য পদ ব্যবহার করিলে ব্যাপ্তির লক্ষণকে সংকীর্ণ করা হয়।

কোনও স্থলে ব্যাপ্য আছে, ইহা সাক্ষাৎভাবে জানিতে পারিলে তথায় যে ব্যাপকও আছে এই জ্ঞান জন্মে। ইহাই অনুমিতি। ব্যাপ্যের জ্ঞানের পশ্চাৎ এই জ্ঞান হয় বলিয়া ইহাকে বলা হয় অনুমিতি। অনুমিতির যাহা করণ বা অব্যবহিত পূর্ব্ব-ভাবী তাহাই অনুমান। যাহাতে ব্যাপক আছে এই জ্ঞান লাভ করিলাম, তাহাতে যে ব্যাপ্য আছে এই জ্ঞানটি অনুমিতির অব্যবহিত পূর্ব্বভাবী; সুতরাং অনুমিতির করণ বা অনুমান। বাপ্যরূপ চিহ্ন হইতে ব্যাপকের জ্ঞান লাভ হয় বলিয়া ইহাকে লিঙ্গও বলা হয়। যে স্থলে ব্যাপ্যরূপ লিঙ্গ দর্শনে তথায় ব্যাপক-রূপ লিঙ্গী আছে বলিয়া অনুমিতি হয় সেই স্থলকে বলা হয় পক্ষ।

এখন নিম্নলিখিত কথা কয়েকটির অর্থ সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। "বাপ্যস্য পক্ষ ধর্ম্মত্বজ্ঞানং লিঙ্গপরামর্শঃ। লিঙ্গপরামর্শজন্য-জ্ঞানমনুমিতিঃ। অনুমিতি করণমনুমানম্। অতএব লিঙ্গ পরামর্শ এবানুমানম্।"

ব্যাপক ব্যাপ্যের নিয়ত সহচর। কোন স্থলে ব্যাপ্য প্রত্যক্ষ হইলে সেই স্থলে যে ব্যাপক আছে এই জ্ঞান অনুমিতি। পক্ষে যে ব্যাপ্য আছে এই জ্ঞানটি লিঙ্গপরামর্শ। ইহাই অনুমিতির অব্যবহিত নিয়ত পূর্ব্বভাবী বা করণ। সুতরাং ইহাই অনুমান।

গোতম প্রদত্ত অনুমানের লক্ষণ এই :—"তৎপূর্ব্বকং ত্রিবিধমনুমানং পূর্ব্ববৎ শেষবৎ সামান্যতো দৃষ্টঞ্চ"। তৎ পূর্ব্বকং অর্থাৎ পক্ষে ব্যাপ্যের প্রত্যক্ষ জন্য অনুমিতির যে করণ তাহাই অনুমান। ইহা তিন প্রকার; পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ এবং সামান্যত দৃষ্ট। পূর্ব্ববৎ অনুমানে কারণ হইতে কার্য্যের এবং শেষবৎ অনুমানে কার্য্য হইতে কারণের অনুমান করা হয়। পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধজ্ঞাপক ব্যাপ্তি হইতে যে অনুমান করা হয় তাহা হয় পূর্ব্ববৎ বা শেষবৎ এবং কেবল সহাবস্থিতি প্রকাশক ব্যাপ্তি (অর্থাৎ যে ব্যাপ্তিতে ব্যাপ্য এবং ব্যাপক এক আধারে একই সময়ে থাকে কেবল এইরূপ সম্বন্ধ প্রকাশ করে) হইতে যে অনুমান করা হয়, ইহা সামান্যত দৃষ্ট অনুমান। সহজ ভাষায় এই বলা যায় যে, কার্য্য কারণ সম্বন্ধ প্রকাশক ব্যাপ্তি জ্ঞান হইতে যে অনুমান তাহা হয় পূর্ব্ববৎ কারণ হইতে কার্য্যের অনুমান অথবা শেষবৎ কার্য্য হইতে কারণের অনুমান। ব্যাপ্য ও ব্যাপক এক সময়ে একাধারে নিয়তই বর্ত্তমান আছে, এইরূপ সম্বন্ধপ্রকাশক ব্যাপ্তি হইতে যে অনুমান করা হয় তাহা হয় সামান্যত দৃষ্ট অনুমান। ঘন মেঘ হইতে বৃষ্টির অনুমান পূর্ব্ববৎ অনুমান। ধূম হইতে বহ্নির অনুমান শেষবৎ অনুমান। কোনও পশুকে চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিতে দেখিলে, তাহার পায়ের খুর যে দ্বিখণ্ডিত এইরূপ অনুমান সামান্যত দৃষ্ট অনুমান।

২৪, ২৩৮

প্রত্যেক ব্যাপ্তিতেই ব্যাপক, হয় ব্যাপ্যের অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে থাকে, না হয় এক সময়ে একাধারে বর্ত্তমান থাকে। ব্যাপ্য ব্যাপকের এই সম্বন্ধ ভিত্তি করিয়াই অনুমানকে পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ এবং সামান্যত দৃষ্ট এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে। এই কথাটি মনে থাকিলে সূত্রের প্রকৃত অর্থ সুস্পষ্টভাবে মনে উদয় হয়। পূর্ব্ববৎ অনুমানে পক্ষ অর্থাৎ যে স্থান ব্যাপ্য আছে, তাহা

পূর্ব্ববৎ অর্থাৎ কারণবৎ, ইহা যে শেষবৎ বা কার্য্যবৎ হইবে, তাহা অনুমান করা হয়। শেষবৎ অনুমানে পক্ষ এখন শেষবৎ বা কার্য্যবৎ আছে, ইহা যে পূর্ব্ববৎ বা কারণবৎ ছিল তাহা অনুমান করা হয়। সামান্যত দৃষ্ট অনুমানে পক্ষকে ব্যাপ্যবৎ দেখিলে ইহা যে ব্যাপকবৎও তাহা অনুমান করা হয়।

এখন অল্প কথায় এবং সহজ ভাষায় ব্যাপ্তির লক্ষণ দেওয়া যাইতে পারে। দুই পদার্থের মধ্যে যদি এইরূপ সাহচর্য্য থাকে যে তাহাদিগের মধ্যে একটি যে স্থলে আছে অপরটিও সেই স্থলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে বা অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে নিয়তই অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে অন্যনিরপেক্ষ হইয়া থাকেই থাকে, তবে এইরূপ সাহচর্য্যকে বলা হয় ব্যাপ্তি। যেটি সহচর সেইটি ব্যাপক এবং যেটির সহচর সেইটি ব্যাপ্য। পদার্থ দুইটি পরস্পর পরস্পরের সহচর হইলে ইহা সমব্যাপ্তি এবং তাহা না হইলে ইহা বিষমব্যাপ্তি। ভাষ্যকারগণ ব্যাপ্তি সম্বন্ধটিকে যেরূপ দুর্ব্বোধ্য এবং জটিল বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, ইহা তত জটিল কিম্বা দুর্ব্বোধ্য নহে। জ্ঞানী অজ্ঞানী সভ্য অসভ্য সকলেরই ব্যাপ্তি জ্ঞান আছে, কেবল ইহার নাম যে ব্যাপ্তি এই জ্ঞানটি নাই। ঘন মেঘ দেখিলে বৃষ্টি পড়িবে আশঙ্কা করিয়া বালক, বৃদ্ধ, জ্ঞানী, অজ্ঞানী সকলই বৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষার আশ্রয়ের প্রতি ধাবিত হয়। দশ মাস বয়সের শিশুও পদশব্দ শুনিয়াই মায়ের আগমন জানিতে পারে। পূর্ব্ববৎ অনুমানে পক্ষকে ব্যাপ্যবান দেখিয়া ইহা যে ব্যাপকবান হইবে এই অনুমান করা হয়; শেষবৎ অনুমানে ইহাকে ব্যাপ্যবান দেখিয়া ইহা যে ব্যাপকবান ছিল এই অনুমান করা হয়; সামান্যত দৃষ্ট অনুমান দ্বারা ইহাকে ব্যাপ্যবান দেখিয়া ইহা যে ব্যাপকবান আছে এইরূপ অনুমান করা হয়।

সূত্রটির অর্থ এইরূপ সুস্পষ্ট হইলেও ভাষ্যকারগণ ইহার

ব্যাখ্যায় সকলে এক মত হইতে পারেন নাই। তাহার কারণ এই যে, যে ভিত্তির উপরে গোতম অনুমানের শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদিগের চোখে পড়ে নাই এবং ইহার কারণ এই যে, প্রকৃতিতে কার্য্য কারণ সম্বন্ধ নিরপেক্ষ হইয়া একাধারে একই সময়ে ব্যাপ্য ব্যাপকরূপে যে অবস্থান করে এইরূপ পদার্থযুগলের দৃষ্টান্ত অতি বিরল।

ন্যায়সূত্রে ভাষ্যকার বাৎসায়ন পূর্ব্ববৎ এবং শেষবৎ অনুমানকে যথাক্রমে কারণ হইতে কার্য্যের এবং কার্য্য হইতে কারণের অনুমান বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু সামান্যত দৃষ্ট অনুমানের যেরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা হইতে এই মনে হয় যে, গোতম সামান্যত দৃষ্ট অনুমান দ্বারা কোন্ প্রকার অনুমান লক্ষ্য করিয়াছেন তাহার তিনি সুস্পষ্ট ধারণা করিতে পারেন নাই। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দ্বারা কথাটি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু ইহাদিগের গোড়ার কথা কি তাহা উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং দৃষ্টান্তও সব স্থলে ঠিক হয় নাই। তাহার ব্যাখ্যা হইতে আমার প্রথম মনে হইয়াছিল, তিনি যেন এই বলিতে চাহেন যে, পূর্ব্ববৎ ও শেষবৎ অনুমান ব্যতীত আর যত প্রকার অনুমান আছে, উহারা সকলই সামান্যত দৃষ্ট অনুমান। এইরূপ ব্যাখ্যা করিলেও ব্যাখ্যা ঠিকই হয়। কিন্তু তাঁহার প্রদত্ত দৃষ্টান্তসকল হইতে এবং যে ভাবে তিনি সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা হইতে মনে হয় গোতম সামান্যত দৃষ্ট অনুমান দ্বারা কি বুঝাইতে চাহেন, তিনি যেন তাহা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। বাৎসায়ন প্রদত্ত কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নে উল্লেখ করা যাইতেছে।

কর্ত্তা করণের সাহায্য ভিন্ন কোনও কার্য্য করিতে পারে না। দর্শন, শ্রবণাদি কার্য্য। ইহাদিগের জন্যও করণের প্রয়োজন। সুতরাং মনে করিতে পারি, ইহাদিগের করণরূপে ইন্দ্রিয় আছে।

ইহা ত শেষবৎ অনুমানই হইল। করণত কারণেরই অংশ, সুতরাং ইহাতেত কার্য্য হইতে কারণেরই অনুমান হইল। তাঁহার প্রদত্ত আর একটি উদাহরণ এই ঃ—আমরা দেখিতে পাই যে, রূপ, রস প্রভৃতি গুণের আশ্রয়স্বরূপ দ্রব্য আছে। ইচ্ছা, দ্বেষ প্রভৃতিও গুণ। তাহাদিগের আশ্রয়স্বরূপও যে আত্মা দ্রব্য আছে, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। ইহা সামান্যতো দৃষ্ট অনুমান। অবশ্য গুণমাত্রেরই যদি দ্রব্যরূপ আশ্রয় থাকে এবং গুণ ও দ্রব্য ব্যাপ্য ব্যাপক সম্বন্ধবিশিষ্ট হয় ও তাহাদিগের মধ্যে কার্য্য কারণ অর্থাৎ নিয়ত পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধ না থাকে, তবে ইহা যে একটি সামান্যতো দৃষ্ট অনুমান ইহা সত্য। তবে গুণ এবং দ্রব্যের মধ্যে কার্য্য কারণ সম্বন্ধ আছে কিনা, ইহা অন্য কথা। এই বিষয়ে দার্শনিকগণ এক মত নহেন। বাৎসায়নের মতে প্রত্যক্ষের অযোগ্য বিষয়েই সামান্যতো দৃষ্ট অনুমান সচরাচর ব্যবহৃত হয়।

আর একটি উদাহরণ দিতে যাইয়া তিনি বলেন যে, যদি দুইটি বস্তুর মধ্যে অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য থাকে এবং একটি বিশেষ ধর্ম্ম একেতে আছে, ইহা জানা থাকে এবং অন্যেতে আছে কিনা, এই সন্দেহ থাকে, তবে আমরা এইরূপ অনুমান করিতে পারি যে, দুইটি বস্তু যখন এত বিষয়ে একরূপ তখন তাহারা এই বিষয়েও একরূপ। এইরূপ অনুমান সামান্যতো দৃষ্ট অনুমান। এই ব্যাখ্যাটি উপমান প্রমাণের একটি সুন্দর ব্যাখ্যা। ইহা ব্যাপ্তি জ্ঞানমূলক নহে; সুতরাং ইহা অনুমানই নহে। যে ব্যাখ্যা উপমানের হওয়া উচিত, তাহাকে অনুমানের ব্যাখ্যায় খাটাইয়া ভাষ্যকারদিগের মধ্যে কেহ কেহ উপমানের ব্যাখ্যায় এক বিভ্রাট সৃষ্টি করিয়াছেন। উপমান প্রমাণের আলোচনার সময়, এই বিষয় পুনরায় আলোচনা করা যাইবে।

বাৎসায়ন অন্য এক ভাবেও পূর্ব্ববৎ এবং শেষবৎ অনুমানের

ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দুইটি বস্তুর মধ্যে একটিকে যখন নিয়তই অন্যটির সঙ্গে থাকিতে দেখা যায়, তখন শেষোক্তটিকে কোন স্থলে দেখিলে পূর্ব্বোক্তটি যে সেই স্থানে আছে এই প্রকার অনুমানের নাম পূর্ব্ববৎ। এই অনুমানে ত ব্যাপ্যের জ্ঞান হইতেই ব্যাপকের অনুমান করা হয়। প্রত্যেক অনুমানেই ত এই কথা। ইহাতে পূর্ব্ববতের বিশেষত্ব কি হইল? শেষবতের দ্বিতীয় প্রকার ব্যাখ্যায় তিনি বলেন যে, যখন একটি বস্তু সম্বন্ধে এই জ্ঞান থাকে যে, ইহা হয় ক, না হয় খ, না হয় গ, তখন যদি দেখান যায় যে, ইহা ক নহে, খও নহে, তবে অনুমান করা যায় যে, ইহা ইহাদিগের মধ্যে শেষটি অর্থাৎ গ। শেষ কথাটি সত্য বলিয়া অনুমান করা হয় বলিয়া ইহা শেষবৎ। এই অনুমানও ব্যাপ্তি জ্ঞানমূলক নহে, সুতরাং ইহাও অনুমান নহে। একটি কথা হইতে পারে যে গোতমসূত্রে ব্যাপ্তির কোনও লক্ষণ দেওয়া হয় নাই এবং ইহা বলাও হয় নাই যে প্রত্যেক অনুমানকে ব্যাপ্তিমূলক হইতে হইবে। সুতরাং বাৎসায়নের ব্যাখ্যার দোষ দেওয়া যাইতে পারে না। অবশ্য বাৎসায়ন যদি এই কথা বলিতেন যে পূর্ব্ববৎ এবং শেষবৎ অর্থাৎ কারণ হইতে কার্য্যের এবং কার্য্য হইতে কারণের অনুমান ব্যতীত আর সকল প্রকার অনুমানই সামান্যতো দৃষ্ট, তবে তাঁহার কথা ঠিক হইত। কিন্তু তিনি স্পষ্ট ভাষায় তাহা বলেন নাই। তাঁহার ব্যাখ্যা এবং উদাহরণসকল হইতে যদি কেহ মনে করে যে, এই সূত্রটির প্রকৃত অর্থ কি, এই বিষয়ে তাঁহার সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না এবং যে ভিত্তির উপরে গোতম অনুমানের শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন, তাহাও তিনি ঠিক ধরিতে পারেন নাই, তবে এইরূপ মনে করা যে অযৌক্তিক হইবে, তাহা বলা যাইতে পারে না।

সে যাহাই হউক, এখন দেখা যাউক নব্য নৈয়ায়িকগণ এই

সূত্রটির কিরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে ব্যাপ্তি তিন প্রকার। অন্বয়ীব্যাপ্তি, ব্যতিরেকীব্যাপ্তি এবং অন্বয়ীব্যতিরেকী-ব্যাপ্তি। ভিন্ন ভিন্ন স্থলে দুইটি বস্তুকে যদি এইরূপ সম্বন্ধবিশিষ্ট দেখা যায়, যে স্থলে একটি আছে সেই স্থলে অপরটি আছেই আছে তবে মনে করা যাইতে পারে যে, তাহাদিগের মধ্যে ব্যাপ্য ব্যাপক সম্বন্ধ আছে। এই প্রকার ব্যাপ্তি নিরূপণ প্রণালীকে বলে অন্বয়ীপ্রণালী এবং নিরূপিত ব্যাপ্তির নাম অন্বয়ী ব্যাপ্তি। যদি দুইটি বস্তুর মধ্যে এইরূপ সম্বন্ধ দেখা যায় যে, যে স্থলে একটি থাকে না সেই স্থলে অপরটিও থাকে না, তবে মনে করা যাইতে পারে যে, বস্তু দুইটির মধ্যে ব্যাপ্য ব্যাপক সম্বন্ধ আছে। ব্যাপ্তি নিরূপণের এই উপায়ের নাম ব্যতিরেকী প্রণালী এবং নিরূপিত ব্যাপ্তির নাম ব্যতিরেকী ব্যাপ্তি। আবার যদি বস্তু দুইটিকে এইরূপ সম্বন্ধবিশিষ্ট দেখা যায় যে, যে স্থলে একটি আছে সেই স্থলে অপরটিও আছে এবং যে স্থলে অপরোক্তটি নাই সেই স্থলে পূর্ব্বোক্তটিও নাই তবে মনে করা যাইতে পারে যে বস্তুদ্বয়ের মধ্যে ব্যাপ্য ব্যাপক সম্বন্ধ আছে। ব্যাপ্তি নিরূপণের এই প্রণালীর নাম অন্বয়ী-ব্যতিরেকী প্রণালী এবং ব্যাপ্তির নাম অন্বয়ী ব্যতিরেকী ব্যাপ্তি। ইংরাজীতে এই তিন প্রণালীকে যথাক্রমে—Positive method of agreement, negative method of agreement and method of difference বলা হয়।

নব্য নৈয়ায়িকগণের ব্যাপ্তির এই শ্রেণী বিভাগ যে শুদ্ধ, তাহাতে ভুল নাই। কিন্তু তাঁহারা ইহাও বলেন যে, গোতমের পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ এবং সামান্যতো দৃষ্ট অনুমান যথাক্রমে অন্বয়ী ব্যাপ্তিমূলক, ব্যতিরেকী ব্যাপ্তিমূলক এবং অন্বয়ী ব্যতিরেকী ব্যাপ্তি-মূলক অনুমান। এই কথা ভ্রমাত্মক।

গোতমের শ্রেণীবিভাগের ভিত্তি ব্যাপ্য ব্যাপকের কালিক

সম্বন্ধের উপর অর্থাৎ তাহারা কি একই সময়ে একাধারে থাকে, না একটির অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে অপরটি থাকে—এই সম্বন্ধের উপর। নব্য নৈয়ায়িকদিগের শ্রেণী বিভাগের ভিত্তি ব্যাপ্তি নিরূপণের প্রণালী। উভয়ের মতে অনুমান তিন শ্রেণীর হইলেও একের তিন শ্রেণী ও অপরের তিন শ্রেণী এক নহে। অন্বয়ী অনুমান পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতো দৃষ্ট, তিন রূপই হইতে পারে। সুতরাং অন্বয়ী ব্যাপ্তিমূলক অনুমানকে কেবল পূর্ব্ববৎ অনুমান বলা ভ্রমাত্মক। কথাটি একটি উদাহরণ দ্বারা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করা যাইতেছে। মনে করুন, কোনও এক গ্রামের অধিবাসীদিগের ব্যবসা ভিত্তি করিয়া এক ব্যক্তি তাহাদিগের শ্রেণী বিভাগ করিয়া দেখিল যে, তাহারা তিন শ্রেণীর লোক, তন্তুবায়, কর্ম্মকার এবং কুম্ভকার। আর একজন শিক্ষাকে ভিত্তি করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত এবং অশিক্ষিত এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করিল। শ্রেণী বিভাগের ভিত্তি অনুসারে, এই দুই প্রকার শ্রেণী বিভাগের প্রত্যেকটিই শুদ্ধ। কিন্তু যদি কেহ বলে যে এই দুই প্রকার শ্রেণী বিভাগ একই অর্থাৎ তন্তুবায়, কর্ম্মকার এবং কুম্ভকারই যথাক্রমে শিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত এবং অশিক্ষিত, তবেই কথায় গোল বাঁধিবে। নব্য নৈয়ায়িকগণ পূর্ব্ববৎ শেষবৎ এবং সামান্যতো দৃষ্ট অনুমানকে যথাক্রমে অন্বয়ী, ব্যতিরেকী এবং অন্বয়ী ব্যতিরেকী অনুমান মনে করিয়া সেই ভ্রমেই পতিত হইয়াছেন।

সাংখ্যসূত্রে অনুমানের যে লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে তাহা এই ঃ—

প্রতিবন্ধদৃশঃ প্রতিবদ্ধজ্ঞানমনুমানম্।

একটি বস্তুর সহিত আর একটি নিয়ত বাঁধা অবস্থায় থাকিলে শেষোক্তটিকে বলা হয় প্রতিবদ্ধ। ব্যাপ্যের সহিত ব্যাপক সর্ব্বদাই বাঁধা থাকে। যে স্থলে ব্যাপ্য আছে সেই স্থলে ব্যাপক নিশ্চয়ই

থাকিবে। সুতরাং প্রতিবন্ধের জ্ঞান আর ব্যাপ্তির জ্ঞান একই কথা। কোন স্থলে ব্যাপ্য দেখিলে সেই স্থলে যে ব্যাপক বা প্রতিবদ্ধ আছে এই জ্ঞানই অনুমান। জ্ঞান শব্দের অর্থ জ্ঞানকরণম্ হইলে লক্ষণটি অনুমান প্রমাণের, আর জানা হইলে লক্ষণটি অনুমা বা অনুমিতির। বলা বাহুল্য যে লক্ষণটি অনুমাণের সুতরাং প্রতিবদ্ধ জ্ঞানের যাহা করণ তাহাই অনুমান। এখানে সুত্রটির বিশ্লেষণ করিলে আমরা লিঙ্গ পরামর্শ ই পাই। সুতরাং এই সূত্র অনুসারেও লিঙ্গ পরামর্শ ই অনুমান।

উক্ত হইয়াছে যে লিঙ্গ পরামর্শই অনুমিতির করণ বা অনুমান। কোনও স্থলে লিঙ্গ অর্থাৎ ব্যাপ্য আছে এই জ্ঞানই লিঙ্গ পরামর্শ। এই জ্ঞানের পরই তথায় যে ব্যাপক আছে তাহার অনুমিতি হয়। কেবল লিঙ্গ পরামর্শ জন্য যে অনুমিতি ইহা হইল স্বার্থানুমিতি। ইহা অন্যকে বুঝাইতে হইলে যুক্তি অবলম্বন করিতে হয়। এই যুক্তি প্রকাশের জন্য বাক্যও ব্যবহার করিতে হয়। যে সকল বাক্য দ্বারা এই যুক্তি প্রকাশ করে তাহাদিগের সমষ্টিকে বলা হয় ন্যায়। ইহা পরার্থানুমিতি। ন্যায় সম্বন্ধীয় বিচারই গোতমসূত্রের প্রধান আলোচনার বিষয়। এইজন্য গোতম সূত্রের অপর নাম ন্যায়দর্শন। ন্যায়েতে ব্যবহৃত হইলে ব্যাপ্যকে বলা হয় হেতু এবং ব্যাপককে বলা হয় সাধ্য এবং যে স্থলে ব্যাপ্য দেখিয়া তথায় যে ব্যাপক আছে বা ছিল অথবা থাকিবে এইরূপ নির্ণয় করা যায় তাহাকে বলা হয় পক্ষ। ন্যায়ে ব্যবহৃত বাক্য সকলকে বলা হয় ন্যায়ের অবয়ব।

নিম্নে গোতম প্রদত্ত একটি পূর্ণাঙ্গ ন্যায়ের উল্লেখ করা যাইতেছে।

(১) এই পর্ব্বত বহ্নিমান (প্রতিজ্ঞাবয়ব)।

(২) যে হেতু ইহা হইতে ধূম উত্থিত হইতেছে (হেত্ববয়ব)।

(৩) যে যে স্থল হইতে ধূম উত্থিত হয় সেই সেই স্থলে বহ্নি থাকে, যথা রন্ধনশালা (উদাহরণাবয়ব)।

(৪) এই পর্ব্বত হইতে ধূম উত্থিত হইতেছে (উপনয়াবয়ব)।

(৫) অতএব এই পর্ব্বত বহ্নিমান (নিগমনাবয়ব)

এই প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য গ্রীক দার্শনিক এরিষ্টটুল প্রদর্শিত ন্যায়ের স্বরূপ এবং ইহার সহিত গোতম প্রদর্শিত ন্যায়ের সহিত কতকটা তুলনামূলক আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

এরিষ্টটুলের মতে ন্যায়ের (syllogismএর) অবয়ব তিনটি।

যথা :—(১) সকল ধূমবান পদার্থ বহ্নিমান (major premise)

(২) এই পর্ব্বত ধূমবান (minor premise)

(৩) অতএব, এই পর্ব্বত বহ্নিমান (conclusion)

দুইটি ন্যায়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ মাত্রই দেখা যাইবে গোতমের ন্যায়ের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবয়বের দৃষ্টান্ত অংশ পরিত্যাগ করিয়া তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম অবয়ব বিশিষ্ট ন্যায় এবং এরিষ্টটুলের ন্যায় একই হইয়া দাঁড়ায়। পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের ভাষায় ন্যায়কে বলে সিলজিজ্‌ম্ (syllogism)। মোটের উপর যদিও ন্যায় এবং সিলজিজম্ একই তথাপি এই উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য না আছে তাহা নহে। এই পার্থক্য যে কেবল আকারগত তাহা নহে। ইহা নামগত এবং ব্যবহারগতও বটে।

উক্ত হইয়াছে, যে ন্যায়ে ব্যবহৃত হইলে ব্যাপ্যকে বলে হেতু ব্যাপককে বলে সাধ্য, যে স্থলে ব্যাপ্য দৃষ্টে তথায় যে ব্যাপক আছে এইরূপ অনুমান করা হয় তাহাকে বলে পক্ষ। এরিষ্টটুলের ন্যায়েতে হেতুকে বলে মধ্যপদ (middle term), সাধ্যকে বলে প্রধান পদ (major term) এবং পক্ষকে বলে ক্ষুদ্র পদ (minor term)। ন্যায়েতে যেমন যাহা হেতু তাহাকে ব্যাপ্য হইতেই হইবে

তেমন (syllogismএর) যাহা মধ্যপদ (middle term) তাহাকে ব্যাপ্য (distributed) হইতেই হইবে। ন্যায়েতে যেরূপ হেতু ব্যাপ্য না হইলে যুক্তি হেত্বাভাসদুষ্ট হয়, তেমন syllogism ও মধ্যপদ ব্যাপ্য (distributed) না হইলে যুক্তিতে হেত্বাভাস দোষ ঘটে।

সিলজিজম্ শব্দ দ্বারা দুইটী সম্বন্ধ সংযোগ পূর্ব্বক যে একটি তৃতীয় সম্বন্ধ নিরূপণ করা হয়, তাহার প্রকাশক বাক্যসমষ্টি বুঝায়। ন্যায় শব্দের দ্বারা, যে যুক্তির দ্বারা আমাদের মন বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে নীত হয় অর্থাৎ জ্ঞাত সত্য হইতে অজ্ঞাত সত্যের জ্ঞানলাভ করে, তাহার প্রকাশক বাক্যসমষ্টি বুঝায়। এই ভাবগত পার্থক্য যে কেবল বাক্যসমষ্টির নামে আবদ্ধ তাহা নহে। ন্যায়ের অন্তর্গত প্রত্যেক অবয়বের এবং পদের নামেও এই পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

উল্লিখিত ন্যায়টিতে তিনটী পদ, "বাহ্নিমান" "ধূমবান" এবং "এই পর্ব্বত"। এরিষ্টটুলের নামকরণ অনুসারে বহ্নিমান পদটি প্রধান পদ। গোতমের নামকরণ অনুসারে বহ্নি বা বহ্নিমত্ব সাধ্য। বহ্নিমান পদটিকে প্রধানপদ বলিবার ভাবগত উদ্দেশ্য এই যে, তিনটি পদের মধ্যে বহ্নিমান পদ দ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক ব্যক্তি বুঝায়। সাধ্যপদ বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, বহ্নিমত্ব এই পর্ব্বত সম্বন্ধে সাধনা অথবা প্রমাণ করিতে হইবে। এরিষ্টটুলের নামকরণ অনুসারে "এই পর্ব্বত" পদটি ক্ষুদ্র পদ, সংস্কৃত ন্যায়ে ইহা পক্ষপদ। ক্ষুদ্রপদ বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, এই তিনপদের মধ্যে ইহা দ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা অল্প সংখ্যক ব্যক্তি বুঝায়। পক্ষ বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, ইহা সাধ্য গ্রহণ করে (পক্ষ ধাতুর অর্থ গ্রহণ করা)। ইউরোপীয় ন্যায় অনুসারে ধূমবান পদটি মধ্যপদ, সংস্কৃত ন্যায় অনুসারে ইহা হেতুপদ। মধ্যপদ বলিবার উদ্দেশ্য

এই যে, এই পদটি মধ্যস্থ হইয়া অন্য দুইটি পদের মধ্যে কি সম্বন্ধ আছে তাহা প্রকাশ করে, অথবা ইহা দ্বারা প্রধান পদ হইতে কম এবং ক্ষুদ্রপদ হইতে অধিক সংখ্যক ব্যক্তি বুঝায়। হেতু বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, এইটির সহিত সাধ্য এবং পক্ষের সম্বন্ধজ্ঞানই অনুমানের প্রকৃত কারণ। সেইরূপ ন্যায়ের অবয়ব-সকলের নামকরণেও ভাবগত পার্থক্য আছে। ইউরোপীয় ন্যায়ে যে অবয়বটিকে কনক্লুশান (conclusion) অর্থাৎ শেষাবয়ব বলে, গোতমের নামাকরণ অনুসারে, সেইটির নাম নিগমনাবয়ব। শেষাবয়ব বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, ইহা দ্বারা যুক্তিটি শেষ করা হয়। নিগমনাবয়ব বলিবার উদ্দেশ্য এই যে যুক্তিটি দ্বারা যে অজ্ঞাতপূর্ব্ব সম্বন্ধের জ্ঞানটি প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা এই অবয়বটি দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

অর্থের সূক্ষ্মতার প্রতি লক্ষ্য করিলে স্বীকার করিতেই হইবে যে পারিভাষিক শব্দ সম্বন্ধে ভারতীয় নৈয়ায়িকগণ পাশ্চাত্য নৈয়ায়িকগণ হইতে অপেক্ষাকৃত অধিক কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। এরিষ্টটুলের প্রধান পদ, মধ্যপদ এবং ক্ষুদ্রপদ হইতে ন্যায়ের সাধ্য, হেতু এবং পক্ষ যে অপেক্ষাকৃত অধিক সূক্ষ্মার্থ প্রকাশক তাহার সন্দেহ নাই। কোন কোন ন্যায়ে প্রধান এবং ক্ষুদ্রপদ প্রকৃতপক্ষে প্রধান এবং ক্ষুদ্রপদ নহে। "সকল পশু স্তন্যপায়ী; সকল স্তন্যপায়ী মেরুদণ্ডবিশিষ্ট; অতএব কোন কোন মেরুদণ্ডবিশিষ্ট জীব পশু।" এই ন্যায়টীতে "পশু" প্রধানপদ এবং মেরুদণ্ডবিশিষ্ট জীব" ক্ষুদ্রপদ; কিন্তু "পশু" এই প্রধানপদ প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক ব্যক্তি বুঝায় না; এবং মেরুদণ্ডবিশিষ্ট এই ক্ষুদ্রপদ সর্ব্বাপেক্ষা কম ব্যক্তি বুঝায় না। কিন্তু "সাধ্য" কিম্বা "পক্ষ" সম্বন্ধে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, সকল আকারের ন্যায়েতেই সাধ্য সাধ্যই এবং পক্ষ পক্ষই। ন্যায় শব্দটীও

সিলজিজম্ শব্দ হইতে অপেক্ষাকৃত অধিক সূক্ষ্মার্থ প্রকাশক। কিন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, ন্যায়ের তৃতীয় অবয়বটির উদাহরণাবয়ব নামকরণটা ঠিক হয় নাই। অবয়বটির মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়াছে হেতু সাধ্যের মধ্যে যে ব্যাপ্তি সমবদ্ধ আছে, তাহা দেখান। সুতরাং ইহাকে উদাহরণাবয়ব না বলিয়া, ব্যাপ্তি প্রদর্শকাবয়ব অথবা এইরূপ অর্থপ্রকাশক কোন নাম দিলে নামটি অধিক সমীচীন হইত।

একটি সিলজিজম্ এবং একটি ন্যায় দেখামাত্রই, উহাদিগের মধ্যে যে অবয়বগত পার্থক্য আছে, তাহার প্রতীতি হয়। ন্যায়ের প্রতিজ্ঞাবয়ব, হেত্বয়ব ও উদাহরণাবয়বের দৃষ্টান্ত অংশটি পরিত্যাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা একটি সম্পূর্ণ সিলজিজম্।

পাশ্চাত্য দর্শনজ্ঞ কেহ কেহ মনে করেন যে, গোতমের পঞ্চাবয়ব "ন্যায়" আর এরিষ্টটুলের "সিলজিজম্"এর অর্থ এক হইলেও, ন্যায় পুনরুক্তি দোষে দুষ্ট। আমাদের মতে এইমতটি ঠিক বলিয়া বোধ হয় না। ন্যায় এবং সিলোজিজমের ব্যবহারগত পার্থক্যই অবয়বগত পার্থক্যের কারণ। ইউরোপীয় নৈয়ায়িক বলেন যে, ন্যায়ের সাধ্যাবয়ব ও পক্ষাবয়বে যাহা দেওয়া আছে, তাহা হইতে কি শুদ্ধ অনুমান করা যায়, তাহার নিরূপণ করাই আমার কার্য্য। সাধ্যবাক্য এবং পক্ষবাক্যে যে বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা বাস্তবিক পক্ষে শুদ্ধ কি অশুদ্ধ, তাহা নিরূপণ করা আমার কার্য্য নহে। প্রকৃতপক্ষে সাধ্যবাক্য ও পক্ষবাক্যে যাহা দেওয়া থাকে, তাহা সত্যই হউক কিম্বা মিথ্যাই হউক, তাহা হইতে ন্যায়ানুসারে কি অনুমান করা যায় তাহা নিরূপণই যদি ন্যায়ের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তবে সংস্কৃত ন্যায়ের প্রতিজ্ঞা ও হেত্বয়বের এবং উদাহরণাবয়বের দৃষ্টান্ত অংশের যে কোনও প্রয়োজন নাই, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু সংস্কৃত নৈয়ায়িকের নিকট

ন্যায়ের ব্যবহার অন্যরূপ। তিনি বলেন, পঞ্চাবয়বসমন্বিত ন্যায় প্রয়োগ করিয়া আমি অনুমান করি না ; আমার অনুমান যে শুদ্ধ, তাহা অন্যকে বুঝাইবার জন্য আমি ন্যায় প্রয়োগ করিয়া থাকি। আমি কি অনুমান করিয়াছি, তাহা প্রথম উল্লেখ করি ; ইহাই আমার প্রতিজ্ঞাবয়ব। তৎপর যে লিঙ্গ বা চিহ্নের সাহায্যে, পক্ষে যে সাধ্য বর্ত্তমান রহিয়াছে, যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহা উল্লেখ করি ; ইহা আমার হেত্ববয়ব। তৎপর আমার লিঙ্গ বা চিহ্নজ্ঞান যে শুদ্ধ তাহা প্রদর্শন করি ; ইহাই আমার উদাহরণাবয়ব। তৎপর পক্ষে যে লিঙ্গ বা চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহা প্রকাশ করি ; ইহাই আমার উপনয়াবয়ব। তৎপর পক্ষে যে সাধ্য বর্ত্তমান রহিয়াছে, ইহা প্রকাশ করি ; ইহা আমার নিগমনাবয়ব। সংস্কৃত নৈয়ায়িকের মতে, কেবল সাধ্যাবয়ব পক্ষাবয়বের যাহা দেওয়া আছে, তাহা হইতে কি অনুমান হইতে পারে, তাহা দেখানই যথেষ্ট নয়। সাধ্যাবয়বে উল্লিখিত বিষয়টি যে সত্য ন্যায়েতে তাহারও প্রমাণ দিতে হইবে। ইহা হইতে দেখা যাইবে যে, যে উদ্দেশ্যে ভারতীয় নৈয়ায়িক ন্যায়ের ব্যবহার করিয়া থাকেন, সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পাঁচটি অবয়বের কোনটিই পরিহার্য্য নহে।

ব্যাপ্তিজ্ঞান জন্মে কি প্রকারে ? ভারতীয় নৈয়ায়িকগণ এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন, ভূয়োদর্শন অর্থাৎ পর্য্যবেক্ষণই ব্যাপ্তিজ্ঞান লাভের একমাত্র উপায়। তাঁহাদিগের মতে তিন প্রণালী অনুসারে ব্যাপ্তি নিরূপিত হইয়া থাকে।—অন্বয়ী, ব্যতিরেকী এবং অন্বয়ব্যতিরেকী। এই অন্বয়ী প্রণালী ও ব্যতিরেকী প্রণালী আর মিলের (Mill) স্বরূপ প্রণালী এবং অন্বয়ব্যতিরেকী প্রণালী আর মিলের বিরূপ প্রণালী একই। ব্যাপ্তি সম্বন্ধে ভারতীয় নৈয়ায়িক-গণের ধারণা পরিষ্কার ছিল, কিন্তু ব্যাপ্তি নিরূপণের প্রকৃত বৈজ্ঞানিক অর্থাৎ বিরূপ এবং অনুমান (deductive) প্রণালী

সম্বন্ধে তাহাদিগের যে পরিষ্কার ধারণা ছিল, এইরূপ বোধ হয় না। পরীক্ষা দ্বারা যে অনেক বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব নিরূপিত হইতে পারে, সম্ভবতঃ সেইদিকে তাঁহারা লক্ষ্য করেন নাই। তাঁহারা পর্য্যবেক্ষণকেই একমাত্র ব্যাপ্তি নিরূপণের উপায় বলিয়া মনে করিতেন। সুতরাং ব্যাপ্তি নিরূপণ বিষয়ে পাশ্চাত্য নৈয়ায়িকদিগের গবেষণা অপেক্ষাকৃত অধিক তথ্যপূর্ণ।

সংস্কৃত ন্যায়ের বিশেষত্ব এই যে, ইহা যে কেবল সাধ্যাবয়ব এবং পক্ষাবয়ব হইতে কি অনুমান হইতে পারে তাহা প্রকাশ করে, তাহা নহে ; ইহাতে সাধ্যবাক্য অর্থাৎ ব্যাপ্তিবাক্যটি যে প্রকৃত পক্ষে সত্য, তাহাও দেখান হয়। "ধূমবান পদার্থ বহ্নিমান" যথা মহানস। এই ব্যাপ্তিবাক্যে উদাহরণটি উল্লেখ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, শ্রোতা যেন দেখিতে পারেন যে ব্যাপ্তি বাক্যটি প্রকৃত-পক্ষেই সত্য।

একটি সম্পূর্ণ ন্যায় নিম্নলিখিত আকারে প্রকাশ করা যাইতে পারে। এই পর্ব্বত হইতে ধূম উত্থিত হইতেছে, ইহাতে বহ্নি আছে কিনা প্রমাণ করিতে হইবে।

ধূমবতী রন্ধনশালা বহ্নিমতী	}	ব্যাপ্তি নিরূপণ
∴ সকলধূমবান পদার্থ বহ্নিমান	}	(Induction)
এই পর্ব্বত ধূমবান	}	ব্যাপ্তি প্রয়োগ
∴ এই পর্ব্বত বহ্নিমান	}	(Deduction)

ইহা হইতে দেখা যায় যে, ন্যায় একাধারে মিলের ইন্‌ডক্‌সন্ এবং এরিষ্টটুলের ডিড'ক্‌সন্। এখানে দেখান যাইতে পারে যে, কেবল এক স্থলে একটি পদার্থকে আর একটি পদার্থের সহচর থাকিতে দেখিলে ইহাদিগের মধ্যে যে ব্যাপ্তি রহিয়াছে, এইরূপ নিরূপণ করিলে অনেক সময়ে ভ্রমে পতিত হইবার সম্ভাবনা। প্রকৃতপক্ষে

কিন্তু একটি উদাহরণের উদ্দেশ্য এই নহে যে, একটি উদাহরণ হইতেই সকল সময়ে ব্যাপ্তি নিরূপণ করা হইয়া থাকে। উদাহরণটি দিবার উদ্দেশ্য এই যে, প্রতিপক্ষ যেন দেখিতে পারেন যে ব্যাপ্তিটি কাল্পনিক নহে। কোন ব্যভিচার থাকিলে তাঁহার নিকট জানা থাকিবার সম্ভব এবং তিনি তাহা দেখাইতে পারিলে ব্যাপ্তিটি ভ্রমাত্মক বলিয়াই পরিত্যক্ত হয়। ন্যায়সূত্র হইতে একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। শব্দ যে নিত্য তাহা প্রমাণের জন্য একজন বলিলেন ;—

শব্দ নিত্য।
কারণ শব্দ অস্পর্শ।
যাহা যাহা অস্পর্শ তাহা নিত্য—যথা আকাশ।
শব্দ অস্পর্শ।
∴ শব্দ নিত্য।

এই স্থলে একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা, অস্পর্শ বস্তুমাত্রই নিত্য এই ব্যাপ্তি প্রদর্শন করা হইয়াছে। এই ব্যাপ্তিটি যে ভ্রমাত্মক তাহা দেখাইতে হইলে অস্পর্শ অথচ অনিত্য, এইরূপ একটি দৃষ্টান্ত জানা থাকার প্রয়োজন। ন্যায়সূত্রে "ন কর্ম্মানিত্যত্বাৎ" এই উদাহরণ দ্বারা ব্যাপ্তিটি যে ভ্রমাত্মক তাহা দেখান হইয়াছে, ইহার অর্থ এই যে, কর্ম্ম অস্পর্শ অথচ অনিত্য ; সুতরাং অস্পর্শ পদার্থমাত্রই নিত্য এই কথা বলা যাইতে পারে না। প্রতিপক্ষের অপেক্ষাকৃত কম অভিজ্ঞতা থাকিলে, তাহাকে অনেক সময় এইরূপ যুক্তি দ্বারা পরাজিত করিতে পারা যায়।

ন্যায়ের ব্যবহার সম্বন্ধে ভারতীয় নৈয়ায়িক এবং মিলের (Mill) মতের মধ্যে অনেকটা সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। মিল বলেন, যাহা অনুমান করা হইয়াছে, তাহা যে সত্য, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য ন্যায়রূপ ছাঁচের ব্যবহার করা হয়। ভারতীয় নৈয়ায়িকগণ

বলেন—যাহা অনুমান করা হইয়াছে, তাহা যে সত্য তাহা অন্যকে বুঝাইবার জন্য ন্যায়ের প্রয়োগ করা হয়। মিল যে ভাবে একটি সিলজিজম্‌কে বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহার সহিত ন্যায়ের সাদৃশ্য সহজেই চক্ষে পতিত হয়। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় ন্যায়গ্রন্থ পাঠ করিয়া মিলের 'সিষ্টেম অব্‌ লজিক' পড়িলে মনে হয় যেন কোনও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানজ্ঞ প্রাচীন ভারতীয় নৈয়ায়িকের লিখিত গ্রন্থই পাঠ করিতেছি।

ন্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় অবয়ব দুইটি প্রতিজ্ঞা এবং হেতু। সাধ্যনির্দ্দেশঃ প্রতিজ্ঞা। প্রতিজ্ঞা সাধ্য কি তাহা নির্দ্দেশ করে। পর্ব্বত বহ্নিমান এই প্রতিজ্ঞা নির্দ্দেশ করে যে পর্ব্বত সম্বন্ধে বহ্নি বা বহ্নিমত্ব সাধন করিতে হইবে। হেতুর সাংজ্ঞাটি এই ঃ—উদাহরণ সাধর্ম্ম্যাৎ বৈধর্ম্ম্যাৎ বা সাধ্যসাধনং হেতুঃ। পক্ষ সমধর্ম্মী অথবা বিপরীতধর্ম্মী উদাহরণের সাহায্যে সাধ্যসাধনের যে উপায় তাহা হেতু। এখন উদাহরণ সধর্ম্ম্যাৎ বৈধর্ম্ম্যাৎ বা কথা দ্বারা গোতম কি লক্ষ্য করেন তাহা নিম্নে উল্লিখিত কয়েকটি ন্যায় দ্বারা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা যাইতেছে।

(১) উদাহরণ সমধর্ম্মী পক্ষবিশিষ্ট ন্যায়

পর্ব্বত বহ্নিমান (প্রতিজ্ঞা)
যেহেতু ইহাতে ধূম আছে (হেতু)
সকল ধূমবান বস্তু বহ্নিমান যেমন রন্ধনশালা (উদাহরণ)
এই পর্ব্বত বহ্নিমান (উপনয়)
অতএব এই পর্ব্বত ধূমবান (নিগমন)

এই ন্যায়ে রন্ধনশালা দৃষ্টান্ত পর্ব্বতের সমধর্ম্মী, উভয়ই ধূমযুক্ত। নিগমন বাক্য আর প্রতিজ্ঞা একই বাক্য অর্থাৎ ন্যায়টি দ্বারা সাক্ষাৎ ভাবেই প্রমাণ করা হইল যে পর্ব্বত বহ্নিমান

এখন উদাহরণবিপরীত ধর্ম্মী পক্ষবিশিষ্ট একটি ন্যায়ের আলোচনা করা যাউক।

পর্ব্বত বহ্নিমান (প্রতিজ্ঞা)।
যেহেতু ইহা ধূমবান (হেতু)।
যাহা যাহা অবহ্নিমান তাহা তাহা ধূমবান নহে। যেমন—
জলাশয় (উদাহরণ)।
এই পর্ব্বত ধূমবান (উপনয়)।
অতএব এই পর্ব্বত অবহ্নিমান নহে।

এই ন্যায়ের দৃষ্টান্তে, জলাশয় পর্ব্বতের বিপরীত ধর্ম্মী, একেতে ধূম নাই অন্যে তাহা আছে। ন্যায়টি দ্বারা পর্ব্বত যে বহ্নিমান ইহা প্রমাণ করা হইল না, প্রমাণ করা হইল যে পর্ব্বত অবহ্নিমান নহে। অর্থাৎ, ইহাতে দেখান হইল যে প্রতিজ্ঞার বিরুদ্ধ কথাটি মিথ্যা। দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ কথা এক সময়ে সত্য কি মিথ্যা হইতে পারে না। একটি সত্য কি মিথ্যা হইলে অপরটিকে মিথ্যা বা সত্য হইতেই হইবে। বহ্নিমান এবং অবহ্নিমান বিরুদ্ধ কথা। অবহ্নিমান মিথ্যা হইলে বহ্নিমান সত্য হইতে হইবে। পক্ষ সমধর্ম্মী উদাহরণবিশিষ্ট ন্যায় দ্বারা সাক্ষাৎভাবেই প্রতিজ্ঞার প্রমাণ করা হয় এবং পক্ষ বিপরীত ধর্ম্মী উদাহরণ দ্বারা প্রতিজ্ঞার বিরুদ্ধ কথা যে মিথ্যা তাহা প্রমাণ করা হয়। আমরা প্রথম প্রকার প্রমাণকে সাক্ষাৎ এবং দ্বিতীয় প্রকার প্রমাণকে গৌণ প্রমাণ বলিতে পারি।

এই দুই প্রকার ন্যায়ের মধ্যে লক্ষ্য করিবার আরও কয়েকটি বিষয় আছে।

প্রথম আকারের ন্যায়ের উদাহরণ, উপনয় এবং নিগমন এই তিন বাক্যই ব্যাপক অন্বয়ী বাক্য এবং দ্বিতীয় প্রকার ন্যায়ের

উদাহরণ ও নিগমন বাক্য ব্যাপক ব্যতিরেকী বাক্য এবং উপনয় বাক্য ব্যাপক অন্বয়ী বাক্য। যে বাক্যে উদ্দেশ্য পদের সহিত বিধেয় পদের অন্বয় করা হয় তাহা অন্বয়ী এবং যে বাক্যে ইহাকে নিষেধ করা হয় তাহা ব্যতিরেকী বাক্য। আরও একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, প্রথম আকারের ন্যায়ে হেতুপদ উদাহরণ বাক্যের উদ্দেশ্য এবং উপনয় বাক্যের বিধেয় এবং দ্বিতীয় আকারের ন্যায়ে ইহা উভয় বাক্যেরই বিধেয়। পাশ্চাত্য ন্যায়-শাস্ত্রে এই দুই প্রকার ন্যায়কে যথাক্রমে বারবারা (Barbara) এবং ছিজারে (Cesare) বলা হয়। সুতরাং নৈয়ায়িক যুক্তিতে ন্যায়দুষ্ট (logical) হেত্বাভাস ঘটিতে পারে না। যখনই কোন হেত্বাভাসের অবতারণা থাকিবে তখন ইহা কেবল বস্তুদুষ্ট (material) হেত্বাভাসই হইবে।

আরও কয়েকটি উদাহরণ দ্বারা উদাহরণ সমধর্ম্মী এবং বিপরীত ধর্ম্মী পক্ষবিশিষ্ট ন্যায়ের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা যাইতেছে। শব্দ অনিত্য জন্যত্বাৎ, এই ন্যায়টিকে পূর্ণরূপে দুই আকারেই প্রকাশ করা যাইতেছে :—

উদাহরণ সমধর্ম্মী ন্যায়।

শব্দ অনিত্য (প্রতিজ্ঞা)।
জন্যত্বাৎ (হেতু)।
সকল জন্য পদার্থ অনিত্য, যেমন ঘট (উদাহরণ)।
শব্দ জন্য (উপনয়)।
∴ শব্দ অনিত্য (নিগমন)।

সাক্ষাৎ ভাবেই প্রমাণ করা হইল যে শব্দ অনিত্য।

বিপরীতধর্ম্মী উদাহরণের ন্যায়।

শব্দ অনিত্য (প্রতিজ্ঞা)।

যেহেতু ইহা জন্য (হেতু)।

কোনও নিত্য বস্তুই জন্য নহে, যেমন,—আকাশ (উদাহরণ)।

শব্দ জন্য (উপনয়)।

অতএব শব্দ নিত্য নহে (নিগমন)।

এই স্থলে শব্দ অনিত্য এই কথার বিরুদ্ধ কথা (অর্থাৎ শব্দ নিত্য) যে সত্য নহে তাহা প্রমাণ করা হইল। সুতরাং গৌণভাবে শব্দ যে অনিত্য তাহাই প্রমাণিত হইল।

সমধর্ম্মী এবং বিপরীতধর্ম্মী উদাহরণে পাওয়া গেলে, যে কোন প্রতিজ্ঞাই উভয় প্রকার ন্যায় দ্বারা প্রমাণ করা যায়। কিন্তু দুই প্রকারের উদাহরণ না পাওয়া গেলে তাহা করিতে পারা যায় না। এই কথার প্রমাণের জন্য আর একটি যুক্তির পরীক্ষা করা যাউক। যুক্তিটি এই :—যদু মরণধর্ম্মী, কেননা, যদু মানুষ। আমাদের যেমন পর্ব্বত বহ্নিমান ধূমাৎ একটি মামুলি ন্যায়, পাশ্চাত্য নৈয়ায়িকদিগের এই যুক্তিটিও একটি মামুলি ন্যায়। পুরোপূরি ন্যায়ে প্রকাশ করিলে ইহা দাঁড়াইবে এইরূপ :—

সমধর্ম্মী উদাহরণ ন্যায়।

যদু মর (প্রতিজ্ঞা)।

যেহেতু যদু মানুষ (হেতু)।

সকল মানুষ মর, যেমন, রামমোহন রায় (উদাহরণ)।

যদু মানুষ (উপনয়)।

∴ যদু মর (নিগমন)।

উদাহরণ বিপরীতধর্ম্মী ন্যায়।

যদু মর (প্রতিজ্ঞা)।

যেহেতু যদু মানুষ (হেতু)।

কোন অমর মানুষ নহে, যেমন—(উদাহরণ)।

যদু মানুষ।

যদু অমর নহে।

এই ন্যায়টির ত্রুটি এই যে, উদাহরণ অবয়বে কোনও অমানুষ অমরের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারিতেছে না। মানুষ বা অমানুষ এমন কোনও অমরই আমাদিগের অভিজ্ঞতার বিষয় নহে। বলা যাইতে পারে যে, দৃষ্টান্তস্থলে কোন দেবতার নামওত উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা পারা যায় না। কেননা গোতম প্রদত্ত দৃষ্টান্তের লক্ষণ হইয়াছে, যাহা বক্তা এবং শ্রোতা, গুরু এবং শিষ্য, শিক্ষক এবং ছাত্র, উভয়ের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার বিষয়, কেবল তাহাই দৃষ্টান্ত হইবার যোগ্য। "লৌকিক পরীক্ষকাণাং যস্মিন্নর্থে বুদ্ধি সাম্যং স দৃষ্টান্তঃ।" কিন্তু কোনও অমর দেবতাই গুরু বা শিষ্য কাহারও—অন্ততঃ শিষ্যের ত নয়ই—অভিজ্ঞতার বিষয় নহে। সুতরাং 'যদু মর' এই প্রতিজ্ঞাটি কেবল এক প্রকার ন্যায়ের দ্বারাই প্রমাণ করা যায়।

শুদ্ধ যুক্তির জন্য হেতু সাধ্যের মধ্যে কেবল আকারগতভাবে নহে, বাস্তবিকভাবেই ব্যাপ্য ব্যাপক সম্বন্ধ থাকা প্রয়োজন। ধূম এবং বহ্নির মধ্যে কেবল কথায় নয়, প্রকৃতপক্ষেই ব্যাপ্য ব্যাপক সম্বন্ধ। প্রকৃতপক্ষেই বহ্নি ধূমের নিয়ত সহচর। আমি যদি বলি, সকল মেরুদণ্ডবিশিষ্ট জীব দ্বিপদ, তবে কেবল কথায় মাত্র বলা হইল যে, মেরুদণ্ডবিশিষ্টত্ব এবং দ্বিপদবিশিষ্টত্বের মধ্যে ব্যাপ্য ব্যাপক সম্বন্ধ আছে ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা সত্য নহে, কারণ অশ্ব প্রভৃতি চতুষ্পদ ও মৎস্য প্রভৃতি নিষ্পদ জন্তুর মধ্যে ইহার ব্যভিচার আছে। কোনোও কোনও সময়ে যাহা বাস্তবপক্ষে সাধ্য ব্যাপ্য নহে, তাহাকে কেবল কথায় হেতুর আভাস দিয়া যুক্তির অবতারণা করা হয়। এই প্রকার দুষ্ট যুক্তিকে বলা হয় হেত্বাভাস। হেতু,

প্রকৃত হেতু নহে কেবল হেতুর আভাসমাত্র। এই জন্যই ইহার নাম হেত্বাভাস। যাহাকে হেতু বলিয়া যুক্তির অবতারণা করা হয়, তাহাতে প্রকৃতপক্ষে হেতুত্ব থাকিতে হইলে, তাহার এবং সাধ্যের মধ্যে প্রকৃপক্ষে ব্যাপ্য ব্যাপক সম্বন্ধ থাকা অপরিহার্য্য।

গোতমের শ্রেণী বিভাগ অনুসারে হেত্বাভাস পাঁচ প্রকার— সব্যভিচার, বিরুদ্ধ, বাধিত, সাধ্যসম এবং সৎপ্রতিপক্ষ।

আমি বলিলাম মানুষ দ্বিপদ জীব, যেহেতু মানুষ মেরুদণ্ড-বিশিষ্ট। এই স্থলে মেরুদণ্ডবিশিষ্টত্বকে হেতু করিয়া দ্বিপদবিশিষ্টত্বকে সাধ্য করা হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মেরুদণ্ডবিশিষ্টত্ব এবং দ্বিপদত্বের মধ্যে ব্যাপ্য ব্যাপক সম্বন্ধ নাই। মেরুদণ্ডবিশিষ্টত্ব দ্বিপদত্বের ব্যাপ্য নহে। ইহার ব্যভিচার আছে—মৎস্য প্রভৃতি নিষ্পদ এবং অশ্ব, গো প্রভৃতি চতুষ্পদের মধ্যে। ইহারা মেরুদণ্ড-বিশিষ্ট কিন্তু দ্বিপদ নহে। এই প্রকার হেতুদুষ্ট যুক্তিকে বলা হয় সব্যভিচার হেত্বাভাস।

আমি বলিলাম, এই প্রজ্বলিত কাষ্ঠখণ্ড শীতল, যেহেতু ইহা বহ্নিমান। এই যুক্তিতে বহ্নিমত্ব হেতু এবং শীতলত্ব সাধ্য। বহ্নিমত্ব এবং শীতলত্ব ইহারা বিরুদ্ধভাব। ইহাদিগের মধ্যে ব্যাপ্য ব্যাপক সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। ইহা আমাদিগের অভিজ্ঞতারও বিরুদ্ধ। এই প্রকার যুক্তিকে বলা হয় বিরুদ্ধ হেত্বাভাস।

বলা হইল, এই প্রজ্বলিত কাষ্ঠখণ্ড শীতল কেননা ইহা দ্রব্য। এই স্থলে দ্রব্যত্ব হেতু এবং শীতলত্ব সাধ্য। কিন্তু দ্রব্যমাত্রই শীতল এই কথা ঠিক নহে, অপরন্তু পক্ষ, প্রজ্বলিত কাষ্ঠখণ্ড যে শীতল, এই কথা আমাদিগের অভিজ্ঞতার দ্বারাই বাধিত হয়। এই প্রকার হেত্বাভাসকে বলা হয় বাধিত হেত্বাভাস।

বিরুদ্ধ এবং বাধিত হেত্বাভাসের মধ্যে পার্থক্য এই যে, পূর্ব্বোক্ত হেত্বাভাসে হেতুসাধ্য বিরুদ্ধধর্ম্মী এবং আমাদিগের অভিজ্ঞতার

বিরুদ্ধ, শেষোক্ত প্রকার হেত্বাভাসে পক্ষ সাধ্য বিরুদ্ধধর্ম্মী এবং আমাদিগের অভিজ্ঞতা দ্বারাও তাহাদিগের মধ্যে যে সম্বন্ধ দেখান হয় তাহা বাধিত হয়।

কোন কোনও ক্ষেত্রে হেতুর হেতুত্ব, অর্থাৎ সাধ্যব্যাপ্যত্ব এখনও প্রমাণিত না হওয়া সত্ত্বেও তাহাকে হেতুরূপে দাঁড়া করাইবার জন্য যে অসিদ্ধ হেতুদুষ্ট যুক্তির অবতারণা করা হয় তাহাকে বলা হয় সাধ্যসম হেত্বাভাস। আমি বলিলাম, মঙ্গলগ্রহে জীব আছে, যেহেতু ইহাতে বায়ুস্তর এবং জল আছে। বায়ুস্তর এবং জল থাকার সহিত জীব থাকার ব্যাপ্য ব্যাপক সম্বন্ধ এখনও প্রমাণ করা হয় নাই, হয়ত বা এইরূপ সম্বন্ধ আছে, কিন্তু ইহা এখনও প্রমাণ দ্বারা সাধিত হয় নাই। সাধ্যসম হেত্বাভাসের এই যুক্তিটি একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত।

পর্ব্বতো বহ্নিমান ধূমাৎ এই যুক্তির বিরুদ্ধে আর একটি আপাততঃ শুদ্ধ যুক্তি উত্থাপন করিয়া বলা হইল, পর্ব্বত বহ্ন্য-ভাববান তুষারাৎ। যেমন পর্ব্বতের একদেশে ধূমদৃষ্টে বলা হইল পর্ব্বত বহ্নিমান তেমন পর্ব্বতের একদেশে তুষারদৃষ্টে বলা হইল পর্ব্বত বহ্ন্যভাববান। এই প্রকার বিরুদ্ধ যুক্তিকে বলা হয় সৎ-প্রতিপক্ষ। বিরুদ্ধ যুক্তিটি আপাততঃ শুদ্ধ বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু ইহা প্রকৃতপক্ষে শুদ্ধ নহে। ইহাতেও হেতুসাধ্যের মধ্যে ব্যাপ্য ব্যাপক সম্বন্ধ নাই। পর্ব্বতের এক দেশে বহ্নি থাকিলে ইহাকে বহ্নিমান বলা যাইতে পারে; কিন্তু ইহার এক দেশে বহ্নি না থাকিলে ইহা বহ্ন্যভাববান অর্থাৎ ইহার কোনও অংশেই বহ্নি নাই এই কথা বলা যাইতে পারে না। অথচ বিরুদ্ধ যুক্তিটিতে এই কথাই বলা হইয়াছে। এই যুক্তিটি শুদ্ধ হইতে হইলে পর্ব্বতের এক দেশে বহ্ন্যভাবের সঙ্গে সমগ্র পর্ব্বতে বহ্নির অভাবের ব্যাপ্য ব্যাপক সম্বন্ধ দেখাইতে হইবে।

যেহেতু তাহা করা হয় নাই সেই জন্য যুক্তিতে অব্যাপ্য হেতুত্ব দোষ বর্ত্তমান। একদেশে, তুষার দৃষ্ট হইলে পর্ব্বত হিমবান এই কথা বলা যাইতে পারে কিন্তু পর্ব্বত বহ্ন্যভাববান অর্থাৎ পর্ব্বতে কোনও দেশে বহ্নি নাই এই কথা বলা যাইতে পারে না।

হেত্বাভাসেও যুক্তিরই অবতারণা করা হয় যদিও যুক্তি নির্দ্দোষ নহে। এই জন্য অনুমানের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গেই হেত্বাভাসেরও আলোচনা করা হইল।

উপমান।

সত্য নিরূপণের তৃতীয় উপায়ের নাম উপমান। দুইটি বস্তুর মধ্যে অনেক বিষয়ে মিল আছে; কোনও একটি বিশেষ বিষয়ে মিল আছে কি না জানা নাই। অনেক সময় আমরা মনে মনে এইরূপ বিচার করি যে, যখন এত বিষয়ে এই দুইটি বস্তুর মধ্যে মিল আছে তখন সম্ভবত এই বিষয়েও মিল আছে। এইপ্রকার বিচার প্রণালীকে উপমান বলে। একটি উদাহরণ দ্বারা কথাটি স্পষ্ট বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। এই পৃথিবী এবং মঙ্গল গ্রহের কথা ভাবা যাউক। পৃথিবীতে বায়ুস্তর আছে, সমুদ্র আছে, নদী আছে, পর্ব্বত আছে, পৃথিবী একটি গ্রহ, ইহা সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরে; এবং নিজের মেরুদণ্ডের চতুর্দ্দিকেও আবর্ত্তিত হয়। মঙ্গলেও বায়ুস্তর আছে, সমুদ্র আছে, পর্ব্বত আছে, নদী আছে। মঙ্গলও একটি গ্রহ এবং সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরে ও নিজের মেরুদণ্ডের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তিত হয়। পৃথিবীতে মানুষ বাস করে, মঙ্গল গ্রহে মানুষ কিম্বা তত্তুল্য কোনও জীব আছে কি না ইহা বিচার্য্য বিষয়। আমরা এইরূপ বিচার করি যে, যখন এত বিষয়ে

পৃথিবীর সহিত মঙ্গল গ্রহের মিল আছে, এবং এই সকল বিষয়ের সহিত মানুষের কার্য্যকারণ সম্বন্ধ না থাকিলেও ইহারা মানুষের জন্য প্রয়োজনীয়, তখন খুব সম্ভবত মানুষ বা তত্তুল্য জীব থাকা সম্বন্ধেও এই দুইটি গ্রহের মধ্যে মিল আছে। কার্য্যকারণ সম্বন্ধ বিশিষ্ট নহে, এই কথাটি বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, কার্য্যকারণ সম্বন্ধ থাকিলে ইহা আর উপমান থাকে না ইহা অনুমান হইয়া পড়ে। মানুষের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয়, এই কথাটি বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, যে সকল বিষয়ে মিল থাকিবে সেই সকল বিষয়ে বিচার্য্য বিষয়ের সহিত একেবারে সম্বন্ধশূন্য না হওয়া চাই। তাহা না হইলে উপমানের মূল্য একেবারেই কমিয়া যাইবে। এই প্রণালীর বিচার দ্বারা পণ্ডিতগণ মনে করেণ যে, খুব সম্ভবত মঙ্গল গ্রহে আমাদের ন্যায় জীব বাস করে। অবশ্য অনুমান বা শাব্দ প্রমাণের ন্যায় উপমান প্রমাণ নিশ্চয়াত্মক নহে। কিন্তু অনেক সময়ে জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক, এই প্রণালীর যুক্তিদ্বারাই আমাদের জীবনের অনেক কার্য্য নিরূপণ করিয়া লই। আপনি হয়ত শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে, অপনার বিচার করিবার ক্ষমতাতে আমার যে বিশ্বাস, ইহার গোড়াতেও উপমানই আমার সহায়। আমার বিচারশক্তির বিষয়ে আমার নিজের অনুভূতি আছে ; আপনার বিচার শক্তি আছে কি না জানি না। কিন্তু যখন জানি যে অনেক বিষয়েই আপনার সঙ্গে আমার মিল আছে তখন ইহাও নিরূপণ করিয়া লই যে এই বিষয়েও আপনার সহিত আমার মিল আছে। অনেক সময় উপমান দ্বারা সত্য ধরিতে না পারা গেলেও, ইহার সাহায্যে সত্যকে কোনদিকে অনুসন্ধান করিতে হইবে, ইহার আভাস পাওয়া যায়। উপমানকে ভিত্তি করিয়াই অনেক বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে।

গোতম প্রদত্ত উপমানের লক্ষণ এই ঃ—

প্রসিদ্ধ সাধর্ম্মাৎ সাধ্যসাধনমুপমানম্।

এই লক্ষণটি দ্বারা অল্প কথায়, অতি সুস্পষ্টভাবে উপমান প্রমাণ দ্বারা কি লক্ষিত হয় তাহা প্রকাশ করা হইয়াছে। দুইটি বস্তু কয়েক বিষয়ে সমধর্ম্মী—ইহা প্রসিদ্ধ অর্থাৎ বক্তা ও শ্রোতা উভয়ের নিকট পরিজ্ঞাত। দুইটি বস্তুর একটির একটা বিশেষ ধর্ম্ম আছে, অপরটির ইহা আছে কি নাই, ইহা প্রসিদ্ধ নহে অর্থাৎ জানা নাই। কোন কোনও ক্ষেত্রে মনে করা যাইতে পারে যে, বস্তুদ্বয় যখন এত বিষয়ে সমধর্ম্মী তখন এই বিষয়েও সমধর্ম্মী হইবে। ইহাই প্রসিদ্ধ সমধর্ম্ম হইতে অপ্রসিদ্ধ সমধর্ম্মরূপ সাধ্যের সাধন।

স্পষ্টই দেখা যায় ইয়োরোপীয় তর্কশাস্ত্রে যাহাকে analogy বলে ইহা তাহাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সূত্রটির অর্থ এইরূপ স্পষ্ট হইলেও ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে কেহ কেহ ইহার ব্যাখ্যায় এক বিভ্রাটের সৃষ্টি করিয়াছেন। আমরা অনুমানের আলোচনায় দেখাইয়াছি যে, বাৎসায়ন, যাহা প্রকৃতপক্ষে উপমান বা analogy, তাহাকে সামান্যতো দৃষ্ট অনুমানের ব্যাখ্যায় খাটাইয়াছেন এবং সেই সময় হইতেই উপমানের ব্যাখ্যার জন্য এক বিভ্রাটের সূত্রপাত হইয়াছে। ব্যাখ্যাকারগণ উপমানের গোড়ার কথা ধরিতে না পারিয়া, ইহাকে আলঙ্কারিক উপমার সহিত একার্থবোধক মনে করিয়া এক মামুলি উদাহরণ দিয়া ব্যাখ্যা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা বলেন, সাদৃশ্য জ্ঞানই উপমান। যে ব্যক্তি গবয় দেখে নাই, তাহাকে যদি বলা যায় যে, গবয় গো সদৃশ, তবে সে এই কথা স্মরণ করিয়া কোনো স্থলে গো সদৃশ একটি জন্তু দেখিলে, ইহাকে গবয় বলিয়া চিনিতে পারিবে। গো সদৃশ গবয়, এই জ্ঞান হইতে সে গবয় চিনিতে পারিল, সুতরাং ইহা উপমান।

এই কথার মধ্যে প্রথম ভ্রম এই যে, গবয়, গো সদৃশ, কেবল এই জ্ঞান হইতে গবয় চিনিতে পারা যায় না। গোকেও গবয় বলিয়া মনে হইতে পারে। উদাহরণে এই ত্রুটি লক্ষ্য করিয়া বর্ত্তমান সময়ের একজন ব্যাখ্যাকার এই কথা বলেন যে, যে ব্যক্তি দাঁড়কাক কিরূপ পাখী তাহা জানে না, তাহাকে যদি বলা হয় যে, দাঁড়কাক সাধারণ কাকের সদৃশই, কিন্তু ইহা হইতে আকারে একটু বড় এবং ইহার রংটা অপেক্ষাকৃত অধিকতর গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ, তবে সে ঐরূপ একটা পাখী দেখিলেই জানিতে পারিবে ইহা দাঁড়কাক। ইহাই উপমান। উদাহরণের জন্য দাঁড়কাককে টানিয়া না আনিয়া এই কথা বলিলেও চলিত যে, গবয় গো সদৃশ বটে, তবে গো-এর ন্যায় ইহার গলকম্বল নাই। গো সদৃশ এবং গলকম্বলশূন্য এই জ্ঞান হইতে, যে গবয় দেখে নাই সে গবয় চিনিতে পারে, ইহা সত্য। কিন্তু এই ভাবে গবয়ের জ্ঞান বা দাঁড়কাকের জ্ঞান কেবলমাত্র প্রসিদ্ধ সধর্ম্ম হইতে পাওয়া যায় না। সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য, এই উভয় জ্ঞান থাকিলে তবে তাহা লাভ করা যায়। কিন্তু গোতম সূত্রে উপমানের লক্ষণে বলা হইয়াছে, যে স্থলে কেবলমাত্র প্রসিদ্ধ সমধর্ম্ম হইতে সাধ্যের নির্ণয় করা হয়, তাহা উপমান। সুতরাং দাঁড়কাক বা গবয় এই দুই উদাহরণের কোনটিতে উপমানের লক্ষণ খাটে না।

বর্ত্তমান যুগের ব্যাখ্যাকারদিগের মধ্যে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এবং অপেক্ষাকৃত প্রাচীন যুগের ব্যাখ্যাকারদিগের মধ্যে সবরস্বামী উপমানের প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের প্রদত্ত উদাহরণ হইতে ইহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। বিশ্বনাথ প্রদত্ত উদাহরণটি এই ঃ—মঞ্জুসা নামক এক প্রকার লতার রসের মৃত সঞ্জীবনী গুণ আছে। বিশল্যকরণী লতা অনেক বিষয়ে মঞ্জুসা সদৃশ। ইহাদিগের রসের বর্ণ, আস্বাদন

এবং গন্ধ এক রকম। মঞ্জুসার রসের মৃত সঞ্জীবনী গুণ আছে। বিশল্যকরণীর রসের ঐ গুণ আছে কিনা ইহা জানা নাই। মনে করা যাইতে পারে যে, যখন এত বিষয়ে মঞ্জুসা এবং বিশল্যকরণী এক রকম তখন খুব সম্ভবত এই বিষয়েও অর্থাৎ মৃত সঞ্জীবনী গুণ বিষয়েও ইহারা এক রকম। এইটি উপমান প্রমাণের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত। ইহা দ্বারা প্রসিদ্ধ সমধর্ম্মিত্ব হইতে অপ্রসিদ্ধ সমধর্ম্মিত্বের সাধন করা হইয়াছে।

সবরস্বামী প্রদত্ত উদাহরণটি আরও সুন্দর। তিনি বলেন, আমার মধ্যে যে চৈতন্যস্বরূপ আত্মা আছে ইহা আমার সাক্ষাৎ অনুভূতির বিষয়। অন্যের মধ্যে এইরূপ আত্মা আছে কিনা, তাহা আমার জানা নাই অর্থাৎ সাক্ষাৎভাবে জানা নাই। তবে অন্যের সঙ্গে যখন প্রবৃত্তি নিবৃত্তি প্রভৃতি বিষয়ে আমার মিল আছে, তখন মনে করিতে পারি যে, এই বিষয়েও তাহাদিগের সহিত আমার মিল আছে। এই ভাবে সাধ্য সাধনের নামই উপমান।

এই সকল হইতে স্পষ্টই দেখা যায় যে বিশ্বনাথ এবং সবর স্বামী, তাঁহারা উভয়েই উপমান প্রমাণ দ্বারা, প্রসিদ্ধ সমধর্ম্ম হইতে অপ্রসিদ্ধ বিষয়ে সমধর্ম্ম নিরূপণই অর্থাৎ ইংরেজীতে যাহাকে analogy বলা হয়, তাহাই বুঝিয়াছিলেন। বৈশেষিক দর্শনে, সকলেরই যে আত্মা আছে ইহা প্রমাণের জন্য যে সকল যুক্তির অবতারণা আছে তাহার একটি এইঃ—প্রবৃত্তিনিবৃত্তী চ প্রত্যগাত্মনি দৃষ্টে পরত্র লিঙ্গম্ (৩।১।১৯) আমার এবং অন্যের মধ্যে যে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি আছে, ইহা প্রসিদ্ধ অর্থাৎ আমার ও অন্যের নিকট জানা। আমার যে আত্মা আছে, ইহা আমার প্রত্যক্ষের বিষয় অন্যের যে আত্মা আছে ইহা আমার প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। কিন্তু তাহা হইলেও প্রবৃত্তি নিবৃত্তি বিষয়ে যখন আমি এবং অন্য সমধর্ম্মী তখন

মনে করিতে পারি যে, আত্মা থাকা বিষয়েও আমি এবং অন্য সমধর্ম্মী। আমার মনে হয় সবর স্বামী তাঁহার উপমান প্রমাণের উদাহরণটির ইঙ্গিত, এই বৈশেষিক সূত্র হইতেই পাইয়াছিলেন।

১৯১০ সনের Asiatic society of Bengalএর Journalএ প্রকাশিত অধ্যাপক বনমালি বেদান্ততীর্থ বিদ্যারত্ন এম্-এ মহোদয় কর্ত্তৃক লিখিত "The pramans of Hindu Logic" শীর্ষক প্রবন্ধে দেখা যায় যে, তিনিও গোতমের উপমান দ্বারা analogyই বুঝিয়াছেন।

শব্দ।

সত্য নিরূপণের চতুর্থ উপায়, শব্দ। কোনও বিষয়ের সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষকারী, তাহার প্রত্যক্ষানুযায়ী ফল বাক্যে প্রকাশ করিলে, ঐ বিষয়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে, তাহার বাক্যই প্রমাণ। ইহাই শাব্দ প্রমাণ। বাক্য শব্দ ঘটিত, এই জন্য ইহার নাম শব্দ। গোতম প্রদত্ত শব্দের লক্ষণ এই ঃ—আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ।

আপ্তব্যক্তির বাক্যই শাব্দ প্রমাণ। আপ্ত কে? যিনি কোনও বিষয়ের অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনিই সেই বিষয়ে আপ্ত, এবং সে বিষয়ের অপরোক্ষ জ্ঞান প্রকাশক তাহার বাক্যই ঐ বিষয়ের শাব্দ প্রমাণ। একটি বিশেষ মনে রাখিবার বিষয় এই যে, স্বয়ং প্রত্যক্ষকারীর বাক্যই শাব্দ প্রমাণ; অন্য কেহ তাহার জ্ঞান বাক্যে প্রকাশ করিলে ইহা শাব্দ প্রমাণ হইবে না। আপনার মাতাঠাকুরাণী স্বয়ং রন্ধনশালায় যাইয়া দেখিলেন খাদ্য প্রস্তুত এবং আপনাকে বলিলেন "খাদ্য প্রস্তুত স্নান করিতে যাও" এই স্থলে আপনার মাতাঠাকুরাণীর বাক্যই, খাদ্য যে প্রস্তুত, এই বিষয়ের প্রমাণ। কিন্তু তিনি যদি

পাচকের নিকট হইতে শুনিয়া বলেন যে খাদ্য প্রস্তুত, তবে তাঁহার বাক্য শাব্দ প্রমাণ হইবে না।

শাব্দ প্রমাণের নিশ্চয়তা নির্ভর করে অনেক বিষয়ের উপর। প্রথমতঃ, বক্তার অপরোক্ষ জ্ঞানটি ঠিক ঠিক মত হওয়া চাই। দ্বিতীয়তঃ তাহার জ্ঞান ঠিক ভাষাতে প্রকাশ করিবার ক্ষমতা থাকা চাই, তৃতীয়তঃ শ্রোতার ও তাহার বাক্যের ঠিক তাৎপর্য্য গ্রহণ করিবার ক্ষমতা থাকা চাই। অর্থাৎ বক্তা এবং শ্রোতা উভয়েরই ভাষাজ্ঞান পরিষ্কার থাকা চাই। যাহার নিশ্চয়তা এত সকল বিষয়ের উপর নির্ভর করে তাহাতে ভ্রম প্রমাদ প্রবেশেরও অবকাশ থাকিয়া যাইতে পারে। তাই শাব্দ প্রমাণ, প্রত্যক্ষ বা অনুমানের ন্যায় নিশ্চয়াত্মক নহে। কিন্তু তাহা হইলেও আমাদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রা নির্ব্বাহে, আমাদিকে অনেক পরিমাণে শাব্দ প্রমাণের উপরই নির্ভর করিতে হয়। বিচারালয়েত এই প্রমাণেরই প্রাচুর্য্য। ইহাকেই বলা হয় প্রত্যক্ষকারীর সাক্ষ্য (Testimony of an eye witness.)

প্রত্যক্ষ প্রকরণে বলা হইয়াছে যে, প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষ জ্ঞান দুই প্রকার। ইন্দ্রিয় ব্যাপারের জন্য জ্ঞান (sensual perccp-tions) এবং ইন্দ্রিয় ব্যাপার নিরপেক্ষ ধ্যানমূলক জ্ঞান (intui-tional perception)। প্রথমোক্তটি লৌকিক প্রত্যক্ষ এবং শেষোক্তটি অলৌকিক প্রত্যক্ষ। সুতরাং শাব্দ প্রমাণকেও অলৌকি এবং লৌকিক এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। বৈদিক ঋষিগণ অলৌকিক প্রত্যক্ষ দ্বারা ইন্দ্রিয়াতীত পারমার্থিক তত্ত্বের অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়া তাহা বাক্যে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এই বাক্যসকলকে বলা হয় শ্রুতি। শ্রুতি অলৌকিক শাব্দ প্রমাণ। লৌকিক প্রত্যক্ষ দ্বারা লব্ধ জ্ঞানকে আমরা যে বাক্য দ্বারা প্রকাশ করি, ইহা লৌকিক শাব্দ প্রমাণ।

শাব্দ প্রমাণকে দৃষ্টার্থ এবং অদৃষ্টার্থভেদেও দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়া থাকে। এক ব্যক্তি বলিল, সে দেখিয়াছে একটি গৃহ অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে ; যাইয়া দেখি ইহা দগ্ধ হইতেছে। ইহা দৃষ্টার্থ। বেদে আছে, অশ্বমেদ যজ্ঞের ফল মৃত্যুর পর ইন্দ্রত্ব লাভ। ইহার ফল ইহলোকে দেখা যায় না, ইহা অদৃষ্টার্থ।

কোন কোনও ব্যাখ্যাকার মনে করেন যে, যিনি আপ্ত হইবেন তাহাকে সর্ব্বপ্রকার ভ্রম-প্রমাদশূন্য হইতে হইবে। কেবল ঋষিরাই সর্ব্বপ্রকার ভ্রম-প্রমাদশূন্য। সুতরাং কেবলমাত্র শ্রুতিবাক্যসকলই শাব্দ প্রমাণ, অন্য বাক্য নহে। এই কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, এই কথা দ্বারা তাঁহারা আমাদিগের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য সাধারণত আমার যে প্রমানের উপর নির্ভর করিয়া চলি, তাহাকে প্রমাণ শ্রেণী হইতে একেবারেই বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়।

আবার কেহ কেহ বলেন যে, যিনি সত্যবাদী, জ্ঞানী, সচ্চরিত্র, বিশ্বাসযোগ্য, তিনিই আপ্ত এবং কেবল তাঁহার বাক্যই শাব্দ প্রমাণ। শাব্দ প্রমাণ ব্যাখ্যার জন্য প্রত্যক্ষকারীকে এত সকল বিশেষণে জড়িত করিলে শাব্দ প্রমাণকে অনাবশ্যকভাবে সংকীর্ণ করা হয়। উক্ত হইয়াছে যে, যদি কোনোও ব্যক্তি কোনো বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়া বাক্য দ্বারা তাহার প্রত্যক্ষানুযায়ী ব্যাপারটি প্রকাশ করে তবেই তাহার বাক্য শাব্দ প্রমাণ, অন্যথায় ইহা শাব্দ প্রমাণ নহে। সুতরাং প্রত্যক্ষকারী জ্ঞানী কি অজ্ঞানী, সচ্চরিত্র কি অসচ্চরিত্র— তাহার প্রত্যক্ষ বিষয়ের অনুযায়ী বাক্যের সত্যতা প্রমাণের জন্য এই সকল প্রশ্ন উঠে না। এই সকল প্রশ্ন উঠে তাহার বাক্যের উপর বিশ্বাস করিয়া আমরা কতটা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারি তাহা লইয়া। কোন কোনও অবস্থায়, সে যাহা বলিল তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে কিনা এই বিষয়ে সংশয় হইলে তাহাকে কূট প্রশ্নাদি

করা হইয়া থাকে। বিচারালয়ে এই প্রথার খুবই প্রচলন দেখা যায়। বাস্তবিক কোন ব্যক্তি যাহা প্রত্যক্ষ করে নাই, যদি তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে এইরূপ বলে, তবে তাহা ত শব্দের লক্ষণ অনুসারেই শাব্দ প্রমাণ হইল না। তাহার জন্য কোন ব্যক্তির প্রত্যক্ষানুযায়ী বাক্যকে শাব্দ প্রমাণ হইতে হইল, তাহাকে সাধু হইতে হইবে, জ্ঞানী হইতে হইবে, সচ্চরিত্র হইতে হইবে, এই সকল কথার কোনও প্রয়োজন নাই। যে কোনও বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়াছে, সে সাধুই হউক বা অসাধুই হউক, সচ্চরিত্রই হউক বা অসচ্চরিত্রই হউক, জ্ঞানীই হউক বা অজ্ঞানীই হউক, সে যদি যাহাপ্রত্যক্ষ করিয়াছে তাহা বাক্যে প্রকাশ করে তবে তাহার বাক্য শাব্দ প্রমাণ।

এই প্রকার শাব্দ প্রমাণ দ্বারা আমাদিগের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার ব্যাপারে অনেক কার্য্য আমরা নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকি। আমার ভৃত্যকে বলিলাম, বাজারে যাইয়া দেখিয়া আস, ফজলী আম উঠিয়াছে কিনা। সে দেখিয়া আসিয়া বলিল, উঠিয়াছে। তাহার বাক্যরূপ শাব্দ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া আমি ফজলি কিনিবার জন্য বাজারে গেলাম। এই স্থলে তাহার বাক্যের প্রমাণ জন্য সে সাধু না অসাধু, জ্ঞানী না অজ্ঞানী প্রভৃতি কোন প্রশ্নই মনে উঠে না। যে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং তাহা যেরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছে, বাক্যে তাহা প্রকাশ করিলেই ইহা ঐ প্রত্যক্ষীকৃত বিষয়ের অস্তিত্বের প্রমাণ। অন্যথা শাব্দ প্রমাণের লক্ষণ অনুসারেই ইহা শাব্দ প্রমাণ হইবে না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রত্যক্ষ কারীর তাহার প্রত্যক্ষানুযায়ী ভাবপ্রকাশক বাক্যই শাব্দ প্রমাণ। বাক্য এইরূপ হওয়া চাই যে ইহা দ্বারা প্রত্যক্ষের বিষয়টি যেন সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ হয় এবং শ্রোতাও বক্তার কথার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারে এমন

হইতে পারে যে প্রত্যক্ষকারী তাঁহার মনের ভাব সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করিতে পারিতেছে না, অথবা পারিলেও শ্রোতা তাহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। এই জন্য বক্তা ও শ্রোতার যে ভাষা জ্ঞানের প্রয়োজন তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন। এবং সেই জন্যই শব্দ প্রমাণের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে, শব্দ ও শব্দ ঘটিত বাক্যেরও কতক পরিমাণে আলোচনা হইয়া থাকে।

নৈয়ায়িকদিগের মতে প্রত্যেক শব্দেরই একটি শক্তি আছে, যাহা দ্বারা ঐ শব্দ তাহার লক্ষিত বস্তুটিকে বোঝায়। বৃক্ষ শব্দ উচ্চারণ করিলেই শাখা পল্লবাদি বিশিষ্ট একটি উদ্ভিদ জাতীয় পদার্থ বোঝায়। ইহাই বৃক্ষ শব্দের অর্থ। এই অর্থ বুঝাইবার জন্য বৃক্ষ শব্দের শক্তি আছে। ইহাই শব্দ শক্তি। শব্দের এই শক্তি নিত্য এবং অর্থের সহিত ইহার সম্বন্ধও নিত্য। কোন শব্দ দ্বারা অন্ততঃ কোন সংস্কৃত শব্দ দ্বারা কোন অর্থ লক্ষিত হইবে ঈশ্বরই তাহা স্থির করিয়া দিয়াছেন।

বাক্য শব্দ সমষ্টি মাত্র। কিন্তু তাহা হইলেও কেবল শব্দ সমষ্টি দ্বারা বাক্যের তাৎপর্য্য গ্রহণ করা যায় না। বাক্যকে অর্থ বা তাৎপর্য্য প্রকাশক বাক্য হইতে হইলে তাহার কয়েকটি বিশেষত্ব থাকা চাই। এই সকলকে বলা হয়, আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা, সান্নিধ্য এবং তাৎপর্য্য। বাক্যের শব্দ সকল এইভাবে সম্বন্ধ বিশিষ্ট হওয়া চাই যে, তাহাদিগের কোনও একটি উচ্চারিত হইলেই যেন আরও কিছু জানিবার জন্য মনে একটা আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়। পান করিতেছে, এই শব্দ শ্রবণ মাত্রেই, কি পান করিতেছে, কে পান করিতেছে ইত্যাদি জানিবার আকাঙ্ক্ষা মনে জাগ্রত হয়। যদি বলা হয়, হরি শীতল জল পান করিতেছে, তবে বাক্যটি পূর্ণ বাক্য হয় এবং আকাঙ্ক্ষাও নিবৃত্তি হয়। কিন্তু যদি বলা হয়, হরি অগ্নি পান করিতেছে তবে ইহা অর্থশূন্য হইবে। কারণ অগ্নির পীত হইবার

যোগ্যতা নাই। আবার কেবল আকাঙ্ক্ষা এবং যোগ্যতা থাকিলেই যথেষ্ট হইল না। বাক্যের শব্দ সকল পরস্পরের সন্নিহিতও হওয়া চাই। প্রাতে রাম, দুইপ্রহরের সময়, শীতল জল এবং সন্ধ্যায় পান করিতেছে, বলিলে ইহা বাক্য হইল না। তারপর, বাক্যের তাৎপর্য্যের জ্ঞানও থাকা চাই। অবস্থা অনুসারে কোন শব্দ কোন অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে ইহা জানাই তাৎপর্য্য জ্ঞান। সৈন্ধব শব্দের এক অর্থ ঘোটক এবং আর এক অর্থ সিন্ধুজাত লবণ। কোন ব্যক্তি আহার করিতে বসিয়া সৈন্ধব চাহিলে সে যে লবণ চাহিতেছে ইহা বুঝাই হইবে তাহার বাক্যের তাৎপর্য্য গ্রহণ। আবার কেহ ঘোড়সোওয়ার হইবার পোষাক পরিধান করিয়া হাতে চাবুক লইয়া ভৃত্যকে সৈন্ধব আনিবার আদেশ করিলে বুঝিতে হইবে যে, সে ঘোটক চাহিতেছে লবণ চাহিতেছে না। অবস্থাভেদে একই বাক্যের যে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করিতে হয় তাহাই বাক্যের তাৎপর্য্য। সুতরাং বাক্যের অর্থ বুঝিতে হইলে তাৎপর্য্যের জ্ঞানও অপরিহার্য্য। এইজন্য বলা হয় যে, শব্দ সমষ্টিকে বাক্য হইতে হইলে, তাহাদিগের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা, সান্নিধ্য এবং তাৎপর্য্য থাকা চাই।

অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি।

বৈদান্তিক এবং পূর্ব্বমীমাংসার ব্যাখ্যাকারদিগের মধ্যে কুমারিল ভট্টের শিষ্যেরা অর্থাপত্তি এবং অনুপলব্ধিকেও পৃথক প্রমাণ বলিয়া মনে করেন। অর্থাপত্তি এবং অনুপলব্ধি দ্বারা এই শ্রেণীর দার্শনিকগণ কিরূপ প্রমাণ লক্ষ্য করেন, তাহাদিগের প্রদত্ত উদাহরণসকল হইতে তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যাইতে পারে। এক ব্যক্তি সুস্থকায়, অথচ দিনে আহার করে না। ইহা

হইতে আমরা মনে করিতে পারি যে, সে রাত্রিতে আহার করে। এই জ্ঞান প্রত্যক্ষ, শব্দ কিম্বা উপমান জন্য নহে, ইহা অনুমান জন্যও নহে, কারণ ইহা ব্যাপ্তিজ্ঞানমূলক নহে। সুস্থদেহ এবং রাত্রিতে আহারের সঙ্গে ব্যাপ্য ব্যাপক সম্বন্ধ নাই। অথচ এই জ্ঞান অনুমানের ন্যায়ই নিশ্চয়াত্মিক—ইহার সত্যতায় কাহারও মনে কোনও সন্দেহের উদয় হয় না। সুতরাং ইহা একটি পৃথক প্রমাণ। যাহা প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ বা উপমান জন্য নহে অথচ যাহার ফল নিশ্চয়াত্মক, তাহাই অর্থাপত্তি। ইহাতে অর্থাপত্তির একটা বিবরণ পাওয়া যায় বটে, ইহা দ্বারা ইহার স্বরূপ লক্ষণ কি তাহা জানা যায় না। ইংরেজী ভাষার একটি শব্দ ব্যবহার করিলে এই বলিতে পারি যে ইংরেজীতে implication বলিতে যাহা বুঝায়, ইহা তাহাই।

নৈয়ায়িকগণ মনে করেন, অর্থাপত্তি অনুমানেরই প্রকারভেদ মাত্র। কিন্তু কি ভাবে ইহা অনুমানের প্রকারভেদ, তাহা তাঁহারা স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করেন নাই। এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, যদিও সুস্থদেহের সহিত রাত্রিতে আহারের ব্যাপ্য-ব্যাপক সম্বন্ধ নাই, তথাপি সুস্থদেহের সহিত আহারের ব্যাপ্য-ব্যাপক সম্বন্ধ রহিয়াছে। সুতরাং অনুমান করা যায় যে, সুস্থদেহ ব্যক্তি আহার করে। তাহা হইলেই, সে হয় দিনে আহার করে, না হয় রাত্রে আহার করে। বাৎসায়ন কর্তৃক শেষবৎ অনুমানের একটি ব্যাখ্যা অনুসারে ইহা শেষবৎ অনুমান। বাৎসায়নের শেষবৎ অনুমানের এই ব্যাখ্যা যে ঠিক নহে, তাহার সমালোচনা আমরা পূর্ব্বেই করিয়াছি। সাপেক্ষ বাক্যঘটিত ন্যায়ের পাশ্চাত্য ন্যায়-দর্শনে উল্লেখ আছে, কিন্তু আমাদিগের ন্যায়ের সাধ্যাবয়বে এইরূপ বাক্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। পাইলে, অর্থা-পত্তিকে অনুমানের প্রকারভেদ বলিয়া দেখানো যাইতে পারিত।

সাপেক্ষ বাক্যঘটিত একটি ন্যায় এইরূপ ঃ—

ক, হয় খ, না হয় গ।

ক, খ নহে।

∴ সুতরাং ক, গ।

সুস্থকায় ব্যক্তি আহার করে, ইহা অনুমান সিদ্ধ।

সুস্থকায় ব্যক্তি হয় দিনে আহার করে, না হয় রাত্রিতে আহার করে।

সুস্থকায় (এই ব্যক্তি) দিনে আহার করে না।

সুতরাং সে রাত্রে আহার করে।

এই ভাবে পাশ্চাত্য নৈয়ায়িকগণ অর্থাপত্তিকে অনুমানেরই প্রকারভেদ বলিয়া দেখাইতে পারেন। আমাদিগের ন্যায়েতে সাপেক্ষ বাক্য ঘটিত সাধ্যাবয়ব (magor premise) না দেখান হওয়ায় অর্থাপত্তিকে অনুমানের প্রকারভেদরূপে দেখাইতে কতকটা অসুবিধা আছে।

অনুপলব্ধি দ্বারা অভাবের অস্তিত্বের প্রমান করা হয়। এই গৃহে কোনো ঘট নাই, ইহাতে ঘটাভাব বর্ত্তমান। এই অভাব প্রত্যক্ষের বিষয় নহে, অনুমানেরও বিষয় নহে, শব্দ বা উপমান জন্যও নহে। তবে ইহার প্রমাণ কি? ইহার প্রমাণ, বৈদান্তিক-দিগের মতে প্রতিযোগীর যোগ্যানুপলব্ধি। প্রতিযোগীর যোগ্যানু-পলব্ধি কথার অর্থ কি? কোনোও বস্তুর অভাবের প্রতিযোগী হইয়াছে সেই বস্তুটি। ঘটাভাবের প্রতিযোগী ঘট। যে স্থলে ঘট বর্ত্তমান থাকিলে ইহার উপলব্ধি হইবার যোগ্যতা আছে, অথচ ইহা উপলব্ধি হইতেছে না, সেই স্থলেই ইহার অভাবের উপলব্ধি হয়। গৃহে আলো আছে, কোনো প্রকার আবরণ নাই। আমার দৃষ্টিশক্তিতেও কোনো দোষ নাই। সুতরাং এই গৃহে ঘট থাকিলে ইহার দৃষ্ট হইবার যোগ্যতা বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু তাহা

সত্ত্বেও ঘট দেখিতেছি না। ইহাই হইল ঘটাভাব প্রতিযোগী ঘটের যোগ্যানুপলব্ধি। ইহাই ঘটাভাবের প্রমাণ। ইহারই নাম অনুপলব্ধি বা অভাব প্রমাণ।

ঐতিহ্য এবং সম্ভব।

পৌরাণিকগণ, ঐতিহ্য এবং সম্ভবকেও পৃথক প্রমাণ বলিয়া মনে করেন। ব্যাখ্যাকারদিগের একটি উদাহরণ হইতে মনে হয় যে, তাঁহাদিগের মতে ঐতিহ্য এবং প্রবাদ (tradition) একার্থ বোধক। গ্রামে প্রবাদ আছে যে একটি বৃক্ষে একটা প্রেত বাস করে। ঐ বৃক্ষে যে প্রেত বাস করে এই প্রবাদই ইহার প্রমাণ। আমার মনে হয় না যে, পৌরাণিকগণ এইরূপ একটা খেলো কথাকে ঐতিহ্য প্রমাণ বলেন। রামায়ণ, মহাভারত এবং পৌরাণিক গ্রন্থে যে সকল রাজ চরিত্র ও তাহাদিগের সমসাময়িক ঘটনার বর্ণনা আছে ঐতিহ্য বলিতে তাঁহারা ইহারই প্রতি লক্ষ্য করিতেন। তাহা হইলে ঐতিহ্য প্রমাণ এবং ইতিহাস এক কথাই হইল। ইতিহাসের প্রামাণ্য অস্বীকার করিতে পারা যায় না। অতিত ঘটনার প্রমাণের জন্য আমাদিগকে অনেক সময়ই ইতিহাসের উপর নির্ভর করিতে হয়। ইতিহাসের ঘটনাবলি যদি লিখকের নিজের প্রত্যক্ষের বিষয় হয় তবেত ইহা শাব্দ প্রমাণই হইল। নৈয়ায়িক দার্শনিকগণও তাহাই মনে করেন। আর যদি ইহা লিখকের প্রত্যক্ষের বিষয় না হয় তবে ইহার প্রামাণ্যের শিকড় কতকটা শিথিল হইয়া পড়ে। আজ কাল যে ভাবে ইতিহাস রচিত হইতেছে তাহাতে মনে হয় যে, অচিরেই ইতিহাসে ইতিহাসে পরস্পরের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হইবে। আমেরিকার প্রসিদ্ধ

দার্শনিক গ্রন্থ প্রণেতা Durant বলেন যে, যদি কেহ আরম্বরের সহিত বিবৃত মিথ্যার অভিজ্ঞতা লাভ করিতে চাহেন, তবে, তিনি যে কোনও ইতিহাস বা আত্ম চরিত পাঠ করিলেই তাহার নমুনা পাইবেন। ইহা অবশ্য অতিশয় উক্তি, কিন্তু ইহার গোড়ায় যে কতকটা সত্য রহিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

সম্ভব বলিতে পৌরাণিকগণ কি প্রকার প্রমাণ লক্ষ্য করেন, ভাষ্যকারদিগের ব্যাখ্যা হইতে তাহা স্পষ্টরূপে জানিতে পারা যায় না। একজন বলেন, কাহারও সহস্র মুদ্রা আছে, ইহা জানা থাকিলে, তাহার যে শত মুদ্রা আছে ইহা সম্ভব প্রমাণ বলিয়া দেয়। আমার মনে হয়, পৌরাণিকগণ সম্ভব দ্বারা এইরূপ কিছু একটা মনে করিতেন না। যাহার সহস্র মুদ্রা আছে, তাহার যে শত মুদ্রা আছে, ইহাত নিশ্চয়াত্মিক জ্ঞান। ইহাতে সম্ভবের কথা অসে কোথা হইতে? বাস্তবিক পক্ষে, যে কোনও প্রমাণই হউক না কেন, কোনও প্রমাণ দ্বারাই আমরা নিশ্চয়াত্মিক জ্ঞান লাভ করিতে পারি না। প্রমাণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যে প্রত্যক্ষ তাহা দ্বারাও আমরা নিশ্চয়াত্মিক জ্ঞান লাভ করিতে পারি না। আমি একটি বৃক্ষ দেখিলাম, অপর এক জনও দেখিল। আমাদের দুই জনের জ্ঞানই যে একরকম তাহা নিশ্চয়রূপে বলা যাইতে পারে না। অথচ আমাদিগের ব্যবহার হইতে আমরা এইরূপ মনে করি যে, খুব সম্ভবত আমাদের উভয়েরই বৃক্ষ সম্বন্ধে জ্ঞান একরূপ। অনুমান সম্বন্ধে এই কথা আরও সত্য। সমস্ত ব্যপ্তি গ্রহের (inductionএর) গোড়াতেই রহিয়াছে এই প্রকার সম্ভব। কয়েক জন মানুষকে মরিতে দেখিয়া আমরা বলি মানুষ মাত্রই মরণশীল। অতিত বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যতের সমস্ত মানুষকে কেহ কখনও দেখে নাই দেখিবেও না—অথচ সকল মানুষ সম্বন্ধেই আমরা বলি মানুষ মরণশীল। এই জ্ঞান নিশ্চয়াত্মিক না হইলেও

ইহাতে কাহারও মনে কোনও সংশয়ের উদয় হয় না। নিশ্চয়াত্মিক নহে অথচ সংশয় রহিত এইরূপ জ্ঞান প্রকাশের জন্য 'খুব সম্ভব ইহা এইরূপ', এই প্রকার বাক্য ব্যবহার করা হয়। ইংরেজীতে highest degree of probability বলিতে যাহা বুঝায়, আমার মনে হয়, পৌরাণিকগণ সম্ভব প্রমাণ দ্বারা তাহাই লক্ষ্য করেন। আমাদিগের দৈনন্দিন জীবন যাত্রায়ও আমরা সম্ভবের উপর নির্ভর করিয়া চলিয়া থাকি। বিচারকগণও কোনও বিষয়ের প্রমাণের নিশ্চয়তার নিরূপণ ব্যাপারে সম্ভবের উপরই নির্ভর করেন। এই highest degree of probability যাহা নিশ্চয়াত্মিক না হইলেও প্রায় নিশ্চয়াত্মিক, আমার মনে হয়, তাহাই পৌরাণিক-দিগের সম্ভব প্রমাণ। একটি প্রশ্ন এই হইতে পারে যে, সম্ভব যখন প্রত্যেক প্রকার প্রমাণের প্রামাণ্যের নিয়ামক, তখন ইহাকে একটা পৃথক প্রমাণ বলিয়া মনে করিবার কোনও কারণ নাই। প্রকৃত পক্ষে পৌরাণিকগণ ব্যতীত অন্য কেহই, দার্শনিকই হউক বা অদার্শনিক হউক, সম্ভবকে একটা পৃথক প্রমাণ বলিয়া মনে করেন না। আমরা যখনই কোনও প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, তখন সম্ভবই হয়, ইহার নিয়ামক। অবশ্য সম্ভবের (degree) মাত্রা আছে। ইহার এক সীমা প্রায় নিশ্চয়াত্মিক জ্ঞান এবং অপর সীমা সংশয় ঘেসা। যতই প্রথম সীমার কাছ ঘেসা হয় ততই ইহাকে প্রায় নিশ্চয়াত্মিকের সমতুল্য মনে করা হয়।

সম্ভব পৃথক প্রমাণ না হইলেও আমরা যখন কোনও প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, তখন সম্ভবই যে ইহার নিয়ামক হয়, পৌরাণিকগণ ইহা লক্ষ্য করিতে পারিয়াছিলেন এবং এই জন্য তাহারা প্রশংসার্হ।

তর্ক, বাদ ও সিদ্ধান্ত।

নৈয়ায়িকগণ সত্য নিরূপনের জন্য এক প্রকার যুক্তির অবতারণা করেন যাহাকে বলা হয় তর্ক। এই প্রণালীর যুক্তিতে, যে মতের সত্যতা প্রমাণ করিতে হইবে তাহা প্রমাণ না করিয়া ইহার বিরুদ্ধ মত যে মিথ্যা বা অসঙ্গত তাহা দেখান হয়। দুইটি বিরুদ্ধ কথা এক সময়ে, মিথ্যা বা সত্য হইতে পারে না। একটি সত্য বা মিথ্যা হইলে অপরটিকে মিথ্যা বা সত্য হইতেই হইবে। সুতরাং আমি যে মত প্রতিষ্ঠিত করিতে চাই ইহার বিরুদ্ধ মত যে মিথ্যা তাহা দেখাইতে পারিলেই আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল অর্থাৎ আমার মত যে সত্য ইহা প্রতিষ্ঠিত হইল। জ্যামিতিক যুক্তিতে অনেক সময় এই প্রকার যুক্তি অবলম্বিত হইয়া থাকে।

একটি ত্রিভুজের ভূমি সংলগ্ন কোণ দুইটি সমান হইলে বাহু দুইটিও পরস্পর সমান হইবে। ইহাতে সোজা ভাবে বাহু দুইটি যে সমান তাহা দেখান হইল না। দেখান হইল যে বাহু দুইটি অসমান হইলে সমগ্র হইতে অংশ বৃহত্তর হইয়া পড়ে। তাহা অসঙ্গত এবং হইতে পারে না। সুতরাং বাহু দুইটি সমান। এই প্রকার যুক্তিকে ইংরেজীতে বলা হয় অসঙ্গতি প্রদর্শন (Reductio ad absurdum)। জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক আমাদিগের সকল শ্রেণীর দর্শনেই এইরূপ যুক্তির অবতারণা দেখিতে পাওয়া যায়। ইয়ুরোপীয় দার্শনিকদিগের মধ্যে জিনোকে এই প্রকার তর্কের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া বলা হয়।

সত্য নিরূপণের জন্য এক প্রকার বিচার প্রণালী আছে, যাহাকে বলা হয় বাদ। যিনি কোনও মত প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন, তিনি বাদী এবং এই মতে কোনও দোষ থাকিলে যিনি

তাহা প্রদর্শন করেন, তিনি প্রতিবাদী। প্রত্যেক বাদেই এই প্রকার দুইটি পক্ষ থাকে। বাদী যদি তাহার মতের বিরুদ্ধে প্রদর্শিত প্রত্যেক দোষ খণ্ডন করিতে পারেন, তবে তাহা সত্য বলিয়া গৃহীত হয় এবং সিদ্ধান্তরূপে প্রতিপাদিত হয়; কিন্তু যদি এমন কোনোও দোষ দেখানো হয় যে, তাহা খণ্ডন করিতে পারা যায় না, তবে মতটি অপ্রমাণিত বা অপসিদ্ধান্ত বলিয়া পরিত্যক্ত হয়। একটি বিশেষ মনে রাখিবার বিষয় এই যে, প্রত্যেক বাদেই বাদী এবং প্রতিবাদী উভয়ের লক্ষ্য থাকে, সত্য নিরূপণ করা। যে কোনোও উপায়েই হউক, নিজের মত বজায় রাখা বা পর মত খণ্ডন করার কোনোও প্রয়াস, বাদে থাকিতে পারিবে না। প্রতিবাদীও সত্য নির্ণয়ের জন্যই দোষ দেখাইবে এবং বাদীও সত্য নিরূপণের জন্যই দোষ খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিবে।

বলা হইয়াছে যে কোনও মতের বিরুদ্ধে প্রদর্শিত প্রত্যেক দোষ খণ্ডিত হইলে ইহা সিদ্ধান্তরূপে প্রতিপাদিত হয়। সিদ্ধান্ত শব্দের অর্থ সংস্থিতি (তন্ত্রাধিকরণাভ্যুপগমসংস্থিতিঃ সিদ্ধান্তঃ। ন্যায় ১।১।২৬) অর্থাৎ অটল ভাবে স্থাপিত মত (A firmly established doctrine)। সিদ্ধান্ত চার প্রকার সর্ব্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত, প্রতিতন্ত্র সিদ্ধান্ত, অধিকরণ সিদ্ধান্ত এবং অভ্যুপগম সিদ্ধান্ত। যে সিদ্ধান্ত সর্ব্বশাস্ত্র সম্মত, তাহা সর্ব্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত। যে সিদ্ধান্ত কোনও এক শ্রেণীর শাস্ত্রসম্মত, কিন্তু অন্য শাস্ত্র বিরুদ্ধ, তাহা প্রতিতন্ত্র সিদ্ধান্ত। যে সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইল, ইহার সঙ্গে অন্য সিদ্ধান্তও স্থাপিত হয়, তাহা অধিকরণ সিদ্ধান্ত। সিদ্ধান্ত হইল যে, ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা; ইহার সঙ্গে সঙ্গে এই সিদ্ধান্তও স্থাপিত হইল যে, ঈশ্বর আছেন এবং তিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান। এই স্থলে ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, ইহা অধিকরণ সিদ্ধান্ত। যে সিদ্ধান্ত সত্যতা সম্বন্ধে এখনও বিচার সাপেক্ষ তাহাকে অভ্যুপগম সিদ্ধান্ত

বলে এবং এই সিদ্ধান্তটিকে সত্য বলিয়া ধরিয়া নিলে, ইহার ফল কি হইতে পারে তাহা নির্ণয় করিয়া যদি জগৎব্যাপারের ব্যাখ্যায় ইহা খাটিতেছে দেখা যায়, তবেই যাহা কেবল মাত্র অভ্যুপগম ছিল, তাহাকে পাকা সিদ্ধান্ত বলিয়া স্থির করা হয়। (অপরীক্ষিতাভ্যুপগমাৎ তদ্বিশেষ পরীক্ষণমভ্যুপগমসিদ্ধান্তঃ। ন্যায়সূত্র ১।১।৩১)। ইহা কতকটা পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের Verifiable hypothesis অর্থাৎ প্রমাণযোগ্য কল্পনার ন্যায়, ব্যাপ্তি নিরুপণের জন্য যাহাকে অনুমানপ্রণালী (Deductive method) বলে, তাহার ন্যায়। একটু স্থিরভাবে চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে, সকল প্রকার দার্শনিক গবেষণা প্রণালীর (Speculative or apriori methodএর) গোড়াতেই রহিয়াছে অভ্যুপগম সিদ্ধান্ত। সকল প্রকার দার্শনিক মতেই আদি কারণ বা কারণসকলকে (Ultimate realityকে) একটা কিছু বলিয়া—চৈতন্যই হউক, বা শক্তিই হউক, বা জড়ই হউক—কল্পনা করিয়া তাহার সহিত জগৎ ব্যাপার ব্যাখ্যার চেষ্টা করা হয়। ইহা অভ্যুপগম সিদ্ধান্ত ছাড়া আর কি হইতে পারে ?

জল্প, বিতণ্ডা, ছল, জাতি এবং নিগ্রহ স্থান।

যদি বাদী কিংবা প্রতিবাদীর সত্য নিরূপণের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল নিজ মত বজায় রাখা বা পর মত খণ্ডনই লক্ষ্য হয়, তবে তাহাদিগের মধ্যে যে বাদ প্রতিবাদ হয়, ইহাকে বাদ বলা হয় না, ইহা অন্য নামে প্রকাশিত হয়।

যদি কোনও পক্ষ বা উভয়েই সত্যের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া যে কোনোও উপায়েই নিজ মত বজায় রাখিবার চেষ্টা করে. তবে এই প্রকার বাদ প্রতিবাদকে বলা হয় জল্প। আর যদি কোনও

পক্ষের তাহার নিজের মত বজায় থাকুক আর নাই থাকুক, পর মত খণ্ডন করাই লক্ষ্য হয়, তবে ইহাকে বলা হয় বিতণ্ডা। জল্পাশ্রয়ীর লক্ষ্য থাকে যে কোনও উপায়ে নিজ মত বজায় রাখা এবং বিতণ্ডাশ্রয়ীর লক্ষ্য থাকে, যে কোনও উপায়ে প্রতিপক্ষের মত খণ্ডন করা। তাহাদিগের কাহারও সত্য নিরূপণ প্রধান লক্ষ্য নহে।

বিচারে প্রবৃত্ত পক্ষাপক্ষের মধ্যে যদি কোনও পক্ষ নিজের পরাজয় সুনিশ্চিত এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে দেখিয়া কোনও একটা অপ্রাসঙ্গিক এবং অযৌক্তিক উজুহাতে বিচার হইতে নিবৃত্ত হয়, তবে তাহাকে বলে ছল। ছলেতে সাধারণতঃ প্রতি পক্ষ যে শব্দ যে অর্থে প্রয়োগ করেন, সেই শব্দ সেই অর্থে গ্রহণ না করিয়া তাহার বিপরীত অর্থে গ্রহণ করিয়া তাহার যুক্তির প্রতি মিথ্যা দোষারূপ করা হয়। নৈয়ায়িকদিগের প্রদত্ত ছলের একটি দৃষ্টান্ত এই ঃ—প্রতিপক্ষ বলিল, আজ আমি হরি প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ছলকারী বলিল, তুমি বানরের প্রসাদ খাও, তোমার সঙ্গে আমার বিচার শোভা পায় না। হরি শব্দ দ্বারা বিষ্ণু লক্ষিত হয়েন এবং বানর শব্দেরও একটি প্রতিশব্দ হরি। কোনও একটি ব্যক্তিকে উপলক্ষ করিয়া এক পক্ষ বলিল, এই ব্যক্তি মনুষ্যত্ববর্জ্জিত। এই স্থলে বক্তা মনুষ্যত্ব শব্দটিদ্বারা মানুষের সদগুণসকলকেই লক্ষ্য করিতেছেন, অপর পক্ষ ইহা জানিয়াও ইহাকে সাধারণ মনুষ্যত্ব অর্থে গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বপক্ষের মতে দোষ প্রদর্শন করিল। ইহাও এক প্রকার ছল। এক পক্ষ বাঘ কথাটি আলঙ্কারিক অর্থে ব্যবহার করিয়া বলিল, এদিকে বাঘ আসিতেছে, অপর পক্ষ ইহা জানিয়াও বলিল, বাঘের কি পা আছে যে, বাঘ এদিকে আসিতে পারে? এই প্রকারে এক পক্ষের উক্তিতে অপর পক্ষের দোষ দেখানও এক প্রকার ছল। ছলের যে তিনটি উদাহরণ দেওয়া গেল, ইহাদিগকে যথাক্রমে বলা

হয়—বাক্ ছল, সামান্য ছল এবং উপচার ছল। ছল সম্বন্ধে বিশেষ মনে রাখিবার বিষয় এই যে, ইহাতে এক পক্ষ যে শব্দটি যে অর্থে ব্যবহার করে, অপর পক্ষ ইহা জানিয়াও শব্দটিতে অন্য অর্থ আরোপ করিয়া প্রথম পক্ষের কথায় দোষ দেখাইবার চেষ্টা করে।

হেতু সাধ্যের মধ্যে প্রকৃত ব্যাপ্য ব্যাপক সম্বন্ধ আছে কিনা, তাহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া অবান্তর বিষয়ে পক্ষের সহিত দৃষ্টান্তের সমধর্ম্ম বা বিপরীত ধর্ম্মের উপর ঝোঁক দিয়া প্রতি পক্ষের ন্যায় সঙ্গত যুক্তির উপর যে দোষ আরুপণ করা হয়, ইহা জাতি বা জাত্যুত্তর। সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানং জাতিঃ। (ন্যায় সূত্র ১।৮।১৮) প্রত্যবস্থান শব্দের অর্থ দূষণ—দোষ দেখান। কথাটির অর্থ দুইটী উদাহরণ দ্বারা স্পষ্টতর করিবার চেষ্টা করা যাইতেছে। একজন বলিল কোনও নিত্যবস্তুই জন্য নহে, যেমন অকাশ। শব্দ জন্য, অতএব শব্দ নিত্য নহে। প্রতিপক্ষ বলিল শব্দ নিত্য, অমূর্ত্তত্বাৎ যেমন আকাশ। আকাশের সহিত জন্যত্ব বিষয়ে শব্দ বিপরীতধর্ম্মী বলিয়া যদি শব্দকে অনিত্য বল, তবে মূর্ত্তত্ব বিষয়ে সমধর্ম্মী বলিয়া আকাশের ন্যায় শব্দকেও নিত্য বলিতে পারি। ইহা সমধর্ম্মী জাত্যুত্তর। একজন বলিল শব্দ অনিত্য, জন্যত্বাৎ ঘটবৎ। ইহার উত্তরে প্রতিপক্ষে বলিল শব্দ নিত্য, অমূর্ত্তত্বাৎ আকাশবৎ। এক বিষয়ে অর্থাৎ জন্যত্ব বিষয়ে ঘটের সহিত শব্দ সমধর্ম্মী বলিয়া যদি শব্দ অনিত্য হয়, তবে মূর্ত্তত্ব বিষয়ে বিপরীত ধর্ম্মী বলিয়া শব্দকে নিত্য মনে করা যাইতে পারে। ইহাই বিপরীতধর্ম্মী জাত্যুত্তর। এই উভয় স্থলেই, হেতু সাধ্যের মধ্যে ব্যাপ্যব্যাপক সম্বন্ধ আছে কি নাই, ইহার দিকে লক্ষ্য না কররিয়া অবান্তর বিষয়ে পক্ষ ও দৃষ্টান্তের মধ্যে কোন বিষয় মিল এবং কোন বিষয় গরমিল ইহা অবলম্বন করিয়া প্রতি পক্ষের ন্যায় সঙ্গত যুক্তিতে দোষ দেখান হইয়াছে। এইরূপ অবান্তর বিষয়ের উপর

নির্ভর করিয়া দোষ দেখানই জাত্যুত্তর। প্রকৃতি-কারণবাদী সাংখ্য, ঈশ্বরকারণবাদী বৈদান্তিকের মতে এই দোষ দেখাইল যে, প্রলয়ে বা সৃষ্টির পূর্ব্বে যখন জগৎ ঈশ্বরে লীন থাকে, তখন ঈশ্বরেও অচেতনত্বের প্রসঙ্গ হয়। বৈদান্তিক এই দোষ খণ্ডন করিতে না পারিয়া বলিল যে, সাংখ্যমতেও এই দোষ আছে, কেননা, প্রলয়ে বা সৃষ্টির পূর্ব্বে বিকারবিশিষ্ট জগৎ যখন প্রকৃতিতে লীন থাকে, তখন অবিকৃত প্রকৃতিতেও অবিকারিত্ব অসম্ভব। অতএব এই কারণে যদি প্রকৃতি-কারণবাদে দোষ না হয়, তবে ঈশ্বর-কারণ-বাদেও দোষ হইতে পারে না। ইহা একটি জাত্যুত্তর। এই প্রকার জাত্যুত্তরকে বলা হয় কথাভাস বা মতানুজ্ঞা।

আমাদিগের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ব্যাপারে আমরা অনেক সময় তর্ক বিতর্কে জাত্যুত্তর দিয়া প্রতিপক্ষকে পরাজয় করিবার চেষ্টা করি। বিচারালয়ে পক্ষাপক্ষের এড্‌ভোকেটদিগের সওয়াল-জবাবের প্রতি লক্ষ্য করিলে অনেক সময় জাত্যুত্তরের প্রাচুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। এক ব্যক্তি যে চুরি করিয়াছে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে, তাহার advocate এই প্রমাণ খণ্ডন করিতে না পারিয়া বলিল, অপর পক্ষও একবার চুরির অপরাধে শাস্তি পাইয়াছে। ইহা জাত্যুত্তর।

একজন Attorney তাহার মোয়াক্কেলের কাগজপত্র দেখিয়া জানিতে পারিল যে, তাহার পক্ষে বলিবার কিছু নাই। Counselকে উপদেশ দিল, আমাদিগের পক্ষে বলিবার কিছু নাই, অপর পক্ষের Counselকে গাল দিলেই চলিবে।" ইহা জাত্যুত্তরের একটি আদর্শ নমুনা।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, বিচারের মধ্যে বাদই প্রকৃত এবং দার্শনিক বিচার। ইহাতে বাদী, প্রতিবাদী উভয়েরই লক্ষ্য থাকে,

সত্য নিরূপণ। কেবলমাত্র নিজ মত বজায় রাখা এবং পর মতে দোষ দেখান কোন পক্ষেরই লক্ষ্য নহে।

জল্প বিতণ্ডা, ছল, হেত্বাভাস এবং জাতি প্রভৃতির লক্ষ্য তাহা নহে। যিনি বাদ প্রতিবাদ এই সকলের অবতারণা করিলেন, তিনি এক প্রকারে না এক প্রকারে স্বীকারই করিয়া লইলেন যে, তিনি স্বমত প্রতিষ্ঠিত বা অপর পক্ষের মত খণ্ডন করিতে পারিলেন না। সুতরাং এই সকলকে বলা হয়, নিগ্রহ বা পরাজয়ের স্থান। নিগ্রহ স্থান নানাপ্রকারের। তাহা হইলেও সকল নিগ্রহ স্থানেরই গোড়ার কথা এই যে, পরাজিত পক্ষের, অপর পক্ষের যুক্তি বুঝিতে পারিয়াও যেন বুঝিতে পারা যাইতেছেনা, নানাছলে এইরূপ বলা, অথবা অপেক্ষাকৃত জ্ঞানের অভাববশতঃ বুঝিতে না পারা। অর্থাৎ ইহা এক ভাবে না এক ভাবে, হয় ছল, না হয় অজ্ঞতা।

বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, ছল, জাতি, হেত্বাভাসের প্রয়োগের দৃষ্টান্ত দেখিতে হইলে, আদালতে এড্ভোকেটদিগের বক্তৃতা শুনিলে, এই সকল বিষয়ের বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারা যায়। অবশ্য বাদের অবতারণা কমই দেখা যাইবে, কিন্তু অন্যান্যগুলির অবতারণা ঘন ঘনই লক্ষ্য করিতে পারা যাইবে।

পরিশিষ্ট।

গ্রন্থারম্ভেই বলা হইয়াছে যে, ভারতীয় দর্শনসকল একাধারে প্রমাবিজ্ঞান (Epistemology) এবং পারমার্থিক সত্তাবিজ্ঞান (Ontology)। গ্রন্থে প্রমাবিজ্ঞান সম্বন্ধে দার্শনিক মতসকলের সবিস্তার আলোচনা করা হইয়াছে। সত্তাবিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নাই; এবং ইহা এই গ্রন্থের আলোচনার বিষয়ও নহে। তথাপি পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য এই পরিশিষ্টাংশে এই বিষয়ের যথাসম্ভব অল্প কথায় মোটামুটিরূপে কতকটা আভাস দিবার চেষ্টা করা যাইতেছে।

ভারতীয় দর্শনসকলের মধ্যে আস্তিক দর্শন ছয়খানা। ন্যায় ও বৈশেষিক, সাংখ্য ও পাতঞ্জল, পূর্ব্ব ও উত্তর মীমাংসা। নাস্তিক দর্শনও ছয়খানা। চার্ব্বাক, জৈন, বৈভাসিক, সৌত্রান্তিক, যোগাচার ও মাধ্যমিক।

ন্যায় ও বৈশেষিক।

ন্যায় দর্শন অনুসারে আত্মা, মন, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, দেশ এবং কাল, এই নয়টি পারমার্থিক সত্তা। বৈশেষিক মতেও তাহাই। পার্থক্য এইমাত্র যে, ইহাতে ক্ষিতি, অপ, তেজ এবং মরুৎকে পারমার্থিক না বলিয়া ইহাদিগের অবিভাজ্য পরমাণুসকলকে পারমার্থিক বলা হইয়াছে।

আত্মার অস্তিত্ব বিষয়ে ন্যায় দর্শনের একটি প্রধান যুক্তি হইয়াছে আত্মার তদাত্ম্যানুভূতি। "দর্শনস্পর্শনাভ্যামেকার্থ-গ্রহণাৎ।" যে আমি এই বৃক্ষটি দেখিয়াছিলাম, সেই আমিই

ইহা স্পর্শ করিলাম। যে আমি এক সময়ে স্কুলের ছাত্র ছিলাম, সেই আমিই এখন কলেজের অধ্যাপক। এই প্রকার তদাত্ম্যনু-ভূতি সকলেরই আছে। ইহাই আত্মার অস্তিত্বের একটি প্রমাণ। আর একটি প্রমাণ হইয়াছে স্মৃতি। "নান্যদৃষ্টং স্মরত্যন্যো নৈকং ভূতমপক্রমাৎ।" একজন যাহা দেখিয়াছে, অন্যে তাহা স্মরণ করিতে পারে না। আমাদিগের দেহে অবিশ্রান্তই পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। সাত বৎসর পূর্ব্বে আমার দেহে যে পরমাণুপুঞ্জ ছিল, তাহার একটিও এখন নাই। সাত বৎসর পূর্ব্বের দেহ আর বর্ত্তমানের দেহ সম্পূর্ণ ভিন্ন। অথচ সাত বৎসর পূর্ব্বের কথা আমার মনে আছে। পরিবর্ত্তনশীল দেহের পশ্চাতে এক অপরিবর্ত্তনশীল আত্মা না থাকিলে ইহা হয় কি প্রকারে? পাশ্চাত্য দার্শনিকগণও আত্মার অস্তিত্ব এবং স্থায়িত্ব সম্বন্ধে যে সকল যুক্তি দিয়া থাকেন,তাহাদিগের মধ্যে এই দুইটি যুক্তি প্রধান।

আত্মা কি যতদিন দেহ থাকে ততদিনই থাকে, না, পূর্ব্বে এবং পরেও থাকে? ন্যায় দর্শন বলে, আত্মা স্থায়ী পারমার্থিক সত্তা। "জাতস্য স্তন্যাভিলাষাৎ"। সদ্যজাত শিশুর স্তন্যের অভিলাষ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, আত্মা জন্মের পূর্ব্বেও ছিল। স্তন্যের সংস্কার ছিল বলিয়া জন্ম হওয়ামাত্রই স্তন্যপানের ইচ্ছা হয়। জন্মের পূর্ব্বে থাকিলে পরেও না থাকিবার কোনও কারণ নাই।

আত্মা বিভু-সর্ব্বব্যাপী। "ইচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নসুখদুখজ্ঞানানি আত্মনো লিঙ্গম্।"

মনের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয় এই জন্য যে, কেবল অর্থের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইতে, আমরা অর্থের অনুভূতিলাভ করিতে পরি না। ইহার সহিত মনঃসংযোগের ও প্রয়োজন হয়। মন অনু, কেননা এক সময়ে একাধিক বিষয়ের অনুভূতি হয় না।

যুগপজ্‌ জ্ঞানানুৎপত্তির্ম্মনসো লিঙ্গম্‌। ১।১।১৬

ন্যায় ও বৈশেষিক উভয় দর্শন অনুসারে জগতে সুখ বলিয়া কিছু নাই। ইহা দুঃখ পূর্ণ। সুতরাং আমাদিগের প্রধান কর্ত্তব্য হইয়াছে যাহাতে চিরকালের জন্য এই দুঃখের নিবৃত্তি হয় তাহার চেষ্টা। দুঃখনিবৃত্তিই পুরুষার্থ। এই দুঃখ নিবৃত্তির উপায় কি? ন্যায় দর্শন বলে তত্ত্ব জ্ঞানই ইহার সাধন। যে বস্তু প্রকৃত পক্ষে যাহা তাহাকে সেইরূপ জানাই তত্ত্বজ্ঞান। "তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ।" তত্ত্বজ্ঞান হইতেই সর্ব্বশেষ্ট শ্রেয় যাহা তাহা লাভ হয়। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রেয় হইয়াছে অপবর্গ বা চিরকালের তরে দুঃখ নিবৃত্তি।

দুঃখজন্মপ্রবৃত্তিদোষমিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ। ১।১

মিথ্যাজ্ঞানের ফল দোষ অর্থাৎ রাগ এবং দ্বেষ, রাগ দ্বেষের ফল প্রবৃত্তি, প্রবৃত্তির ফল কর্ম্ম করিবার চেষ্টা। ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্ম হইতেই অদৃষ্টের সৃষ্টি এবং ইহার ফল জন্ম, জন্মের ফল দুঃখ। জন্ম নিরোধ করিতে পারিলেই দুঃখেরও একান্ত নিবৃত্তি হয়। অতএব দেখা যায় যে, ন্যায় দর্শন অনুসারে পদার্থের স্বরূপ জ্ঞান অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করাই আমাদিগের জীবনের সাফল্য। জ্ঞানই পুণ্য এবং অজ্ঞানই পাপ। জ্ঞান হইতেই হয় মুক্তি এবং অজ্ঞান হইতে হয় বন্ধন।

বৈশিষিক দর্শন অনুসারে ও তত্ত্বজ্ঞান হইতেই লাভ হয় মুক্তি বা নিশ্রেয়স।

দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্যবিশেষসমবায়ানাং পদার্থানাং সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্মাভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সম্‌। ১।১২।

ন্যায় এবং বৈশেষিক দর্শনের দুঃখ বাদ হইতে এবং এই দুই দর্শনের পারমার্থিক সত্তার মধ্যে ঈশ্বরের নামের উল্লেখ নাই দেখিয়া কেহ কেহ মনে করেন যে, এই দুইটি দর্শন বৌদ্ধ দর্শনের নামান্তর

মাত্র। এই কথা ঠিক বলিয়া মনে হয় না—ন্যায় দর্শনের ৪।১।১৯ সূত্রে স্পষ্ট ভাষায়ই ঈশ্বরের নামের উল্লেখ আছে। "ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষ কর্ম্মফলাদর্শনাৎ।" কর্ম্ম অচেতন বস্তু; ইহা নিজে কোনও ফল উৎপাদন করিতে পারে না। সুতরাং স্বীকার করিতেই হইবে যে ইহার ফল স্বরূপ সুখ দুঃখ বিধান করিতে পারেন, এমন একজন সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান বিধাতা পুরুষ আছেন এবং তিনিই ঈশ্বর। সুপ্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য দার্শনিক ক্যান্টও ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য এই প্রকার একটি যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন।

বৈশেষিক দর্শনে ঈশ্বরের নাম স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ নাই ইহা সত্য। কিন্তু এই দর্শনেও স্পষ্ট ভাষায়ই বলা হইয়াছে "তৎবচনা দাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্।" বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিতেই হইবে কেন না ইহা তাঁহারই কথা। এই স্থলে তাঁহার শব্দ দ্বারা ঈশ্বরকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। শ্রুতিতে অনেক স্থলে তৎ শব্দ দ্বারা ঈশ্বর বা ব্রহ্মই লক্ষিত হইয়াছে। সুতরাং এই স্থলেও তৎ শব্দ দ্বারা ঈশ্বরকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

আর এক কথা এই যে, যদিও পারমার্থিক সত্তার মধ্যে ঈশ্বরের নামের উল্লেখ নাই তথাপি ইহাদিগের মধ্যে আত্মা পদার্থের উল্লেখ আছে। পারমার্থিক সত্তার মধ্যে আত্মা পদার্থেরই অন্তর্ভূক্ত বলিয়া ঈশ্বররের নাম পৃথক ভাবে উল্লেখ করা হয় নাই। আত্মা দুই প্রকার, পরমাত্মা এবং জীবাত্মা।

সে যাহাই হউক ন্যায় বৈশেষিকে ঈশ্বরের নামের উল্লেখ নাই এই কথা সত্য নহে। তবে এই কথাও সত্য যে এত বড় একটা বিষয়ে এই দুইটি মাত্র সূত্র থাকায় (যাহাদিগকে কেহ কেহ পূর্ব্ব পক্ষের আপত্তি বলিয়া মনে করেন) যদি কেহ মনে করেন যে ন্যায় এবং বৈশেষিক দর্শন প্রকৃত পক্ষে বৌদ্ধ দর্শন, তবে তাহাদের

এইরূপ মনে করা যে একবারেই অযৌক্তিক হইবে ইহাও নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

সাংখ্য এবং পাতঞ্জল।

উক্ত হইয়াছে যে ন্যায় ও বৈশেষিক মতে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ (বৈশেষিক মতে ইহাদিগের পরমাণু), আকাশ, দেশ, কাল, মন এবং আত্মা, ইহারা সকলেই পারমার্থিক সত্তা। আত্মা চিন্ময় বস্তু আর সকলই জড়। সাংখ্য মতে এই সকল জড়বর্গের পশ্চাতে এক সূক্ষ্ম সত্তা আছে। ইহা প্রকৃতি। সকল জড় বস্তুই এক ভাবে না এক ভাবে এই প্রকৃতিরই বিকার বা ইহার বিকারের বিকার। সুতরাং এই মতে এক প্রকৃতি এবং অসংখ্য আত্মা বা পুরুষই পারমার্থিক। এইজন্য এই মতকে প্রকৃতি-পুরুষবাদও বলা হইয়া থাকে। প্রকৃতির প্রথম বিকার ইহা অপেক্ষা স্থূলতর অবস্থা। ইহা বুদ্ধি। বুদ্ধির বিকার অহঙ্কার। অহংকারের বিকার মন, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্রা। পঞ্চ তন্মাত্রার বিকার পঞ্চ মহাভূত। এই সকল প্রকৃতি বিকারই আমাদিগের সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীরের উপাদান। আমাদিগের শরীরে বুদ্ধি বস্তু আছে বলিয়া আমরা ভাল মন্দ বিচার করিতে পারি। অহঙ্কার আছে বলিয়া আমাদিগের দেহাভিমান জন্মে। মন বস্তু আছে বলিয়া আমরা কোন কার্য্য করিব কিনা এইরূপ সঙ্কল্প বা বিকল্প করিতে পারি।

বুদ্ধি, অহঙ্কার, একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ তন্মাত্রা, ইহারা সূক্ষ্ম শরীরের উপাদান এবং পঞ্চ মহাভূত স্থূল শরীরের উপাদান। প্রকৃতি নিজে অচেতন, কিন্তু পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ এই প্রকার

ক্রিয়াশীলা হয় যে, মনে হয় যেন ইহা স্বজ্ঞানেই কার্য্য করিতেছে। চুম্বকের সান্নিধ্যে লৌহ যেরূপ কার্য্যকরী হয় সেইরূপ। প্রত্যেক পুরুষের জন্য প্রকৃতি এক একটি সূক্ষ্ম দেহ নির্ম্মাণ করে। এই দেহ পুরুষে প্রতিবিম্বিত হইলে জবা দ্বারা যেমন স্ফটিক অনুরঞ্জিত হয়, দেহ দ্বারাও পুরুষ সেইরূপ অনুরঞ্জিত হয়। পুরুষ ভ্রমবশতঃ প্রতিবিম্বিত দেহটাকে "আমি" মনে করে। এবং এই প্রকার মনে করাই তাহার বন্ধনের কারণ। এইরূপ মনে করে বলিয়াই নিজেকে দেহের কার্য্যের কর্ত্তা মনে করে। যতক্ষণ এই ভ্রম থাকে ততক্ষণই বন্ধন। বিবেক দ্বারা এই ভ্রম দূর হইলেই মুক্তি। প্রকৃতপক্ষে পুরুষের কোনও বন্ধন নাই। পুরুষ সর্ব্বদাই মুক্ত। প্রতিবিম্বিত দেহটাকে আমি মনে করাই বন্ধন, ইহাকে দেহ-প্রতিবিম্ব বলিয়া জানাই মুক্তি। যখন পুরুষের এই প্রকার বিবেক জন্মে, তখন এই পুরুষ সম্বন্ধে প্রকৃতিরও কার্য্য হয় শেষ—এবং দেহেরও হয় লয় প্রকৃতিতে।

যদিও প্রকৃতিই সকল জড় বর্গের উপাদান, তথাপি ইহা এক রস বস্তু নহে। ইহা সত্ত্ব, রজ এবং তম্ এই অবস্থা ত্রয়ের সাম্যাবস্থা। যতক্ষণ এই অবস্থাত্রয় একে অন্যকে পরাভব করিয়া বিশেষ ভাবে নিজকে প্রকট করিবার চেষ্টা না করে, ততক্ষণই থাকে এই সাম্যাবস্থা। ইহাদিগের এই সাম্যাবস্থার বিঘ্ন ঘটাইবার চেষ্টা হইতেই, এই বৈচিত্রপূর্ণ জগতের সৃষ্টি। সেই জন্য প্রকৃত পক্ষে ইহারাই জগতের উপাদান কারণ। ইহাদিগেব প্রাবল্যের তারতম্যানুসারে, কেহ সাত্ত্বিক কেহ রাজসিক এবং কেহ তামসিক।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সাংখ্যবাদকে সাধারণতঃ প্রকৃতি পুরুষ বাদ বলা হইয়া থাকে। ইহার আর এক নাম সৎকার্য্যবাদ। কারণ, এই মতে কারণে যাহা নাই কার্য্যে তাহা থাকিতে পারে না। কারণের বিকাশই কার্য্য। ন্যায় ও বৈশেষিক মত ইহার বিপরীত।

এই দুই মতে কারণে যাহা নাই কার্য্যে তাহা ঘটে বা ঘটিতে পারে। এই মতকে বলা হয় অসৎ কার্য্যবাদ। আমার মনে হয় বর্ত্তমানে Dependent Emergence দার্শনিক মত বলিতে যাহা বুঝায় ইহা কতকটা তাহারই মত।

পারমার্থিক সত্তা সম্বন্ধে পাতঞ্জলের মতও সাংখ্যেরই অনুরূপ। পার্থক্য এই যে পাতঞ্জলের মতে, পুরুষদিগের মধ্যে এক বিশেষ পুরুষ আছেন যিনি ক্লেশ বিপাক বর্জ্জিত, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান এবং জগৎ ব্যাপারের নিয়ামক এবং ঈশ্বর। এই বিশেষ পুরুষ বা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে বলিয়া পাতঞ্জল দর্শনের আর এক নাম সেশ্বর সাংখ্য। পাতঞ্জল দর্শনের বিশেষত্ব হইয়াছে ইহার অলৌকিক (intuitional) প্রত্যক্ষ লাভের অর্থাৎ সমাধিস্থ হইবার উপায় বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনা।

পূর্ব্বমীমাংসা।

মোটামুটিরূপে বেদকে দুই অংশে ভাগ করা হয়। পূর্ব্বার্দ্ধ এবং উত্তরার্দ্ধ। মন্ত্র বা সংহিতা অংশ পূর্ব্বার্দ্ধ এবং উপনিষৎ সকল উত্তরার্দ্ধ। আপাত বিরুদ্ধ মন্ত্র সকলের মধ্যে যে সামঞ্জস্য আছে তাহা দেখাইবার জন্য পূর্ব্বমীমাংসা রচিত হইয়াছে। পূর্ব্বমীমাংসার প্রণেতা জৈমিনি ; এই জন্য পূর্ব্বমীমাংসাকে জৈমিনি দর্শনও বলা হইয়া থাকে।

এই দর্শন অনুসারে বেদ অপৌরুষেয়। ইহার কোনও রচয়িতা নাই। ইহা স্বয়ম্ভু ; সুতরাং বেদবাক্য, তাহার প্রামাণ্যের জন্য অন্য প্রমাণের উপর নির্ভর করে না। বৈদিক শব্দ সকল নিত্য এবং শব্দের অর্থ ও অর্থের সঙ্গে সম্বন্ধও নিত্য। সুতরাং শব্দ ঘটিত মন্ত্র সকলও নিত্য এবং মন্ত্রের সঙ্গে মন্ত্রের অর্থ বা দেতার

সম্বন্ধও নিত্য। শব্দ এবং শব্দের অর্থ যেরূপ এক, নাম এবং নামী যেরূপ এক সেইরূপ মন্ত্র এবং মন্ত্রের বাচ্য দেবতাও এক। এই মন্ত্র সকলই দেবতা। মন্ত্র, যথাযথরূপে উচ্চারিত হইলে মন্ত্রের দেবতা আকৃষ্ট হয় এবং উপাসকের অভিষ্ট সিদ্ধির সাহায্য করে।

এই দর্শন অনুসারে ইহকালেই হউক বা পরকালেই হউক অভ্যুদয়লাভ করাই পুরুষার্থ। বেদোক্ত যাগ যজ্ঞাদি যথা নিয়মে করিতে পারিলেই, ইহা লাভ হয়। বেদ যখন অপৌরুষেয়, ভ্রম প্রমাদশূন্য তখন বেদনির্দ্দিষ্ট যাগ যজ্ঞাদি যে তাহাদিগের ফল উৎপাদন করিবে তাহাতে সংশয়ের স্থান কোথায়? কোন কোনও যজ্ঞের—যেমন পুত্রেষ্টি যজ্ঞের—ফল ইহকালেই দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোনও যজ্ঞের—যেমন অশ্বমেধ যজ্ঞের—ফল পরকালে ফলিত হয়। যথাযথরূপে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে পারিলে মৃত্যুর পর ইন্দ্রত্বও লাভ হইতে পারে।

পূর্ব্বমীমাংসা মতে আমাদিগের আত্মার অতিরিক্ত মন্ত্র ব্যতীত অন্য কোনও ঈশ্বর নাই। তবে যে মাঝে মাঝে ঈশ্বরের কথা উল্লেখ আছে ইহা যজমানের উপাসা প্রকাশক অর্থবাদ মাত্র।

এই দর্শনে বৈদিক উপদেশ সকলকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। বিধি বাক্য, নিষেধ বাক্য, অর্থবাদ, নামধেয়, এবং মন্ত্র। নিষেধ বাক্য সকলও নিষেধ মুখে বিধি বাক্যই। এই সকল বাক্য মানিয়া তদনুযায়ী বৈদিক কার্য্যাদি করাই পুরুষকার।

উত্তরমীমাংসা।

উক্ত হইয়াছে যে উপনিষৎ সকল বেদের উত্তরার্দ্ধ। উপনিষৎ সকলে যে সকল দার্শনিকতত্ত্ব আছে তাহাদিগের সামঞ্জস্য দেখাইবার

জন্যই উত্তরমীমাংসা রচিত হইয়াছে। এই জন্য বেদান্ত দর্শন বলিতে উত্তরমীমাংসাই বিশেষ ভাবে লক্ষিত হয়। বেদান্ত শব্দের এক অর্থ বেদের অন্ত বা শেষ। উপনিষৎ সকল বেদের শেষ; এই জন্য ইহারা বেদান্ত। বেদান্ত শব্দ দ্বারা চরম জ্ঞানও লক্ষিত হয়। উপনিষৎ সকলেই চরম জ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে, এই অর্থেও ইহাদিগকে বলা হইয়া থাকে বেদান্ত। উত্তরমীমাংসার অপর নাম ব্রহ্মসূত্র। ইহাতে ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম ব্রহ্মসূত্র। উপনিষৎ সকলে উক্ত জ্ঞান, অপেক্ষাকৃত সরল ভাষায় এবং সহজ বোধ্য ভাবে, ভগবদগীতাতে প্রকাশ করা হইয়াছে। এই জন্য ভগবদগীতাকেও বেদান্ত বলা হইয়া থাকে। উপনিষৎ, ভগবদগীতা, এবং উত্তরমীমাংসা এই তিনটি বেদান্তের প্রস্থানত্রয় বা ভিত্তি।

উত্তরমীমাংসা মতে জড় ও জীব জগতের সহিত ব্রহ্মের প্রকৃত সম্বন্ধ কি, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা ইহার ভিন্ন ভিন্ন ভাষ্য রচিত হইয়াছে। কখন কখন এই সকল ভাষ্যও বেদান্ত শব্দ দ্বারা লক্ষিত হইয়া থাকে। এই সকল ভাষ্যের মধ্যে শঙ্করাচার্য্য প্রণীত শারীরক ভাষ্য, রামানুজ প্রণীত শ্রীভাষ্য, নিম্বার্ক প্রণীত পারিজাত সৌরভ ভাষ্য, বল্লভাচার্য্য প্রণীত অনুভাষ্য এবং মধ্বাচার্য্য প্রণীত পূর্ণ প্রজ্ঞা ভাষ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমাদের বঙ্গদেশে বেদান্ত দর্শন এবং শঙ্করের শারীরক ভাষ্য একার্থ বোধক।

উপনিষদে তিন শ্রেণীর শ্রুতি দেখিতে পাওয়া যায়। (১) অদ্বৈত ভাব প্রকাশ শ্রুতি যথা—"যাহা কিছু আছে সবই ব্রহ্ম" (সর্ব্বংখল্বিদংব্রহ্ম) "জীবব্রহ্মই," "আমিব্রহ্মই" "তুমিব্রহ্মই" ইত্যাদি। (২) দ্বৈত ভাব প্রকাশক শ্রুতি যথা—"ব্রহ্ম ও জীব দুইটি সুন্দর পাখী দেহরূপ বৃক্ষে বাসকরে। জীব এই বৃক্ষের ফল আহার করে, ব্রহ্ম দেখেন মাত্র" (মুণ্ডকোপনিষৎ)। সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্ম,

অল্পজ্ঞ জীব এবং জীবের ভোগ্যা প্রকৃতি ইহারা সকলই অজ অর্থাৎ পারমার্থিক (শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ)। (৩) দ্বৈতাদ্বৈত ভাব প্রকাশক শ্রুতি—যেমন "মাকড়সা যেরূপ নিজ হইতে তন্তুনির্গমন করিয়া জাল বিস্তার করে এবং পুনরায় ইহা নিজের মধ্যে গুঠাইয়া লয়, সেইরূপ ব্রহ্মও নিজ হইতে জগৎ বিকাশ করিয়া আবার নিজের মধ্যেই গুঠাইয়া লন" (মুণ্ডকোপনিষৎ)। সুদিপ্ত পাবক হইতে যেরূপ স্ফুলিঙ্গ সকল নির্গত হইয়া ইহাতেই প্রতিনিবৃত্ত হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে জগৎ অভিব্যক্ত হইয়া তাহাতেই প্রতিনিবৃত্ত হয়। (মুণ্ডক)।

শঙ্করের মতে অদ্বৈত শ্রুতি সকলই পারমার্থিক সত্য। দ্বৈত এবং দ্বৈতাদ্বৈত ভাব প্রকাশক শ্রুতি সকল ব্যবহারিক ভাবে সত্য হইলেও ইহাদিগের পারমার্থিকতা নাই। যখন ব্রহ্মই একমাত্র পারমার্থিক তত্ত্ব (সর্ব্বংখল্বিদংব্রহ্ম) এবং তিনি সত্যং জ্ঞানমনন্তম্, তখন এই জগৎ মিথ্যা বিভ্রম দৃষ্টির ফল মাত্র, রজ্জুতে সর্প ভ্রমের ন্যায়। রজ্জু যেমন অবিকৃত থাকিয়াই সর্পভ্রম জন্মায়, তেমন ব্রহ্ম কোনরূপ বিকৃত না হইয়া জগৎভ্রম জন্মায়। আমি শব্দের বাচ্য যে জীবাত্মা, ইহা হয় ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তু, না হয় ব্রহ্মের অংশ না হয় ব্রহ্মই। ব্রহ্মব্যতীত যখন অন্য কোনও সত্তাই নাই তখন ইহা ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তু হইতে পারে না। ব্রহ্মের অংশও হইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে ব্রহ্মের অসীমত্বের ব্যাঘাত হয়। সুতরাং ইহা ব্রহ্মই। অয়মাত্মাব্রহ্ম, অহংব্রহ্মাস্মি, তত্ত্বমসি প্রভৃতি শ্রুতি এই কথার সমর্থক।

অদ্বৈত বাদীরা গর্ব্বের সহিত বলিয়া থাকেন যে কোটি কোটি গ্রন্থে যাহা বলা হইয়াছে আমরা অর্দ্ধশ্লোক দ্বারা তাহা প্রকাশ করিতে পারি। ইহা কি? "ব্রহ্ম সত্যং জগৎ মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব না পরঃ।" ব্রহ্মের সহিত জীবের এই তাদাত্ম্যানুভূতি হইতেই হয় মুক্তি।

দ্বৈতবাদী মধ্ব বলেন যে দ্বৈত ভাব প্রকাশক শ্রুতি সকলই পারমার্থিক সত্য। অদ্বৈত এবং দ্বৈতাদ্বৈত ভাব প্রকাশক শ্রুতি সকল মুক্ত আত্মার প্রসংশাসূচক অর্থবাদ মাত্র। ব্রহ্ম, জীব, এবং প্রকৃতি ইহারা সকলই পারমার্থিক। ব্রহ্ম বা ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ব-শক্তিমান, জীব অল্পজ্ঞ এরং অল্প শক্তিমান। ব্রহ্ম ও জীবে, ব্রহ্ম ও প্রকৃতিতে, „জীবে জীবে, জীবেও জড়ে এবং জড়ে জড়ে, পার্থক্যের অনুভূতি হইতেই হয় মুক্তি। এই অনুভূতি ভক্তি এবং ঈশ্বরের কৃপা সাপেক্ষ।

দ্বৈতাদ্বৈত বাদী রামানুজ, নিম্বার্ক এবং বল্লভাচার্য্যের মতে জীব ও জগৎ এক ভাবে না এক ভাবে ব্রহ্মেরই অংশ। রামানুজ বলেন, এই জীব ও জড়রূপ ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মের দেহ। এই দেহ বিশিষ্ট ব্রহ্মই পারমার্থিক তত্ত্ব। ব্রহ্মকে দেহ বিশিষ্ট বলা হইয়াছে বলিয়া এই মতের নাম বিশিষ্টাদ্বৈত বাদ। সৃষ্টির পূর্ব্বে বা প্রলয়ে এই জগৎ সূক্ষ্মরূপে ব্রহ্মে লীন থাকে। ইহার স্থূল ভাবে অভিব্যক্তিই সৃষ্টি। সূক্ষ্ম দেহ বিশিষ্ট ব্রহ্ম 'কারণ ব্রহ্ম' এবং স্থূল দেহরূপে প্রকাশিত ব্রহ্ম 'কার্য্য ব্রহ্ম।'

নিম্বার্ক স্বামীর মতে, জড় ও জীব জগৎ ব্রহ্মের দেহ নহে। ইহারা ব্রহ্মের দৃক এবং দৃশ্য শক্তির অনুভবযোগ্য আকারের বিকাশ। যে অর্থে শক্তিমান এবং শক্তি এক সেই অর্থে জগৎ ও ব্রহ্ম এক এবং যে অর্থে ইহারা ভিন্ন সেই অর্থে জগৎ এবং ব্রহ্মও ভিন্ন। এই মতের নাম ভেদাভেদ বাদ।

বল্লভাচার্য্য বলেন, জগৎ ব্রহ্মের দেহ বা শক্তির বিকাশ এই কথা ঠিক নহে। ব্রহ্ম সৎ, চিৎ এবং আনন্দ। তিনি তাহার যে অংশে চিৎ এবং আনন্দ অপ্রকট রাখেন তাহা জড় এবং যে অংশে কেবল আনন্দ অপ্রকট রাখেন তাহা জীব। এই প্রকট অপ্রকট অনাদি

কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে। ইহা তিনি করেন কেন? ইহা তাহার লীলা। এই মতের নাম শুদ্ধাদ্বৈত বাদ।

বিশিষ্টাদ্বৈত বাদ, ভেদাভেদ বাদ, এবং শুদ্ধাদ্বৈত বাদ, এই তিন মতেই ভক্তি দ্বারা ঈশ্বরের কৃপালাভ করিলে এই সকল তত্ত্ব জানিতে পারিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়।

এখন দুইটি প্রশ্ন স্বতই মনে উদয় হইবে। ১ম, এই সকল মতের মধ্যে কোনটি সূত্রকারের মতানুযায়ী ব্যাখ্যা। ২য়, সূত্রকারের মতানুযায়ী ব্যাখ্যা যাহাই হউক না কেন, জড় ও জীব জগতের সহিত ব্রহ্মের প্রকৃত সম্বন্ধ কি? প্রথম প্রশ্নের উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে ব্রহ্মসূত্রের উত্তর মীমাংসা নাম হইতে আমরা এইরূপ মনে করিতে পারি যে, ইহার মত কোনও প্রকারের চরম মত হইতে পারে না। শঙ্করের অদ্বৈত মত, চরম জ্ঞান তান্ত্রিকতা (extreme idealistic monism)। মধ্বের মত, চরম বস্তুতান্ত্রিক দ্বৈতবাদ (extreme realistic dualism)। যাহা মীমাংসা (synthesis) তাহাকে এমন একটা মত হইতে হইবে, যাহাতে এই চরম মত সকলেরও সামঞ্জস্য দেখান যাইতে পারে। সুতরাং সূত্রকারের মত একভাবে না একভাবে দ্বৈতাদ্বৈত হওয়াই সম্ভব।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, দুইটি বস্তুর মধ্যে প্রকৃত সম্বন্ধ কি তাহা জানিতে হইলে দুইটির সম্বন্ধের সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। আমাদিগের নিজের সম্বন্ধে আমাদিগের জ্ঞান যাহাই থাকুক না কেন, ব্রহ্মকে সম্যকরূপে জানা মনুষ্যের পক্ষে সম্ভব নহে সুতরাং এই সম্বন্ধ প্রকৃত পক্ষে কি তাহাও সম্যকরূপে জানা অসম্ভব। ইহা একটি রহস্য, গুহ্যাৎ গুহ্যতম্ রহস্য। পঞ্চসহস্রাধিক বৎসর অতীত হইল ঋগবেদের এক ঋষি বলিয়া গিয়াছেন :—

ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদি বা দধে যদিবা ন।

যোহস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্‌সু অংগ বেদ যদিবা ন। ১০।২৯।

এই সৃষ্টি কি ভাবে হইল, এই রহস্য যদি কেহ জানেন, তবে একমাত্র তিনিই জানেন যিনি ইহার অধ্যক্ষ রূপে পরম ব্যোম ধামে আছেন। তিনিও না জানিতে পারেন। তিনিও না জানিতে পারেন এই প্রকার সন্দেহের কারণ এই যে যদি জড় প্রকৃতিও তাহার ন্যায় অনাদি হয়, তবে এক অনাদি তত্ত্ব আর এক অনাদি তত্ত্বের আদি কিরূপে জানিবে ?

উপরোক্ত প্রশ্ন দুইটির আলোচনা এই পরিশিষ্টে সম্ভব নহে। মৎ প্রণীত বেদান্ত সোপান গ্রন্থে ইহার সুবিস্তারিত আলোচনা আছে। পাঠক ইচ্ছা করিলে ঐ গ্রন্থখানা পাঠ করিয়া দেখিতে পারেন।

চার্ব্বাক দর্শন।

প্রাচীন ভারতে এক সময়ে এক শ্রেণীর দার্শনিক ছিল যাহাদিগকে বলা হইত চার্ব্বাক। চার্ব্বাকদিগের মতে ক্ষিতি, অপ, তেজ এবং মরুৎ এই চার শ্রেণীর জড় পদার্থ অর্থাৎ তাহাদিগের পরমানুসকল পারমার্থিক সত্তা। এই ছাড়া অন্য কোনও পারমার্থিক সত্তা নাই। এই চার শ্রেণীর পদার্থের নানাভাবে সংমিশ্রণ হইতেই জগতের সৃষ্টি বৈচিত্র। ইহার পশ্চাতে কোনও সজ্ঞানে পরিচালিত শক্তি নাই। দেহাতিরিক্ত আত্মা বলিয়া কোনও সত্তা নাই। চৈতন্য দেহেরই কার্য্য। তাহাদিগের মতে ঃ—

চতুর্ভ্য খলুভূতেভ্যশ্চৈতন্যমুপজায়তে।

কিণ্বাদিভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ সমেতেভ্যোমদশক্তিবৎ॥

কোনও কোনও চার্ব্বাকের মতে স্থূল দেহই আত্মা কেন না আমি স্থূল, আমি কৃশ এই অনুভূতি সকলেরই আছে। কেহ কেহ বলে ইন্দ্রিয়গণই আত্মা কেন না আমি অন্ধ আমি বধির এই অনুভূতি সকলেরই আছে। কেহ কেহ বলে মনই আত্মা। আমি কোনও কার্য্য করিব কিনা এই প্রকার সঙ্কল্পের অনুভূতি সকলেরই আছে। কেহ কেহ বলে আমি ক্ষুধার্ত্ত আমি তৃষ্ণার্থ এই জ্ঞান হইতে দেখা যায় প্রাণই আত্মা। আবার আমি কর্ত্তা আমি ভোক্তা এই অনুভূতি হইতে কোন কোনও চার্ব্বাক বুদ্ধিকেই আত্মা বলিয়া মনে করে। এই সমস্তই দেহ বা দেহেরই অংশ সুতরাং দেহাতিরিক্ত আত্মা বলিয়া কোনও সত্তা নাই। দেহেরই কার্য্য চৈতন্য প্রবাহ, আমরা না বুঝিতে পারিয়া ইহাকে দেহাতিরিক্ত এক পৃথক সত্তা বলিয়া মনে করি। দেহের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে ইহারও বিনাশ হয়। ঈশ্বর বলিয়া কোনও সত্তা নাই। স্বর্গ নরক বলিয়া কোনও স্থান নাই। সুতরাং স্বর্গ নরক অপবর্গ প্রভৃতি কাল্পনিক বিষয়ে মাথা না ঘামাইয়া আমাদিগের উচিত যাহাতে সুখে জীবন যাপন করা যায় তাহার চেষ্টা করা। "যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ।" এই হওয়া উচিত আমাদিগের নীতি।

বলা বাহুল্য যে চার্ব্বাক দার্শনিকগণ পাশ্চাত্য জড় তান্ত্রিক (Materialistic) দার্শনিকগণের সহিত এক শ্রেণীভুক্ত। পাশ্চাত্য সুখবাদী এপিকিউরাস, প্রটেগোরাস্ প্রভৃতির ন্যায় চার্ব্বাকগণও সুখবাদী। এবং তাহাদিগের ন্যায় চার্ব্বাকদিগের মধ্যেও কেহ কেহ মার্জ্জিত এবং অমার্জ্জিত ভেদে সুখকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন। তাহারা বলেন কেবল ইন্দ্রিয় চরিতার্থ জন্য যে সুখ তাহা অমার্জ্জিত সুখ, ইহা অপেক্ষা শিল্প চর্চ্চায় অর্থাৎ স্থাপত্য ভাস্কর্য্য চিত্রশিল্প বা নাটক কাব্যাদির ন্যায় কথা শিল্পের চর্চ্চায় যে সুখলাভ হয় তাহা মার্জ্জিত সুখ এবং অধিক আদরণীয়।

চার্ব্বাকদিগের লিখিত বিশেষ কোনও দার্শনিক গ্রন্থ নাই। কয়েকটি শ্লোক বিশিষ্ট চার্ব্বাক মত প্রকাশক একখানা পুস্তিকা আছে। কেহ কেহ বলেন বৃহস্পতি ইহার প্রণেতা। সে যাহাই হউক চার্ব্বাক মতও প্রাচীন দার্শনিক মত; জৈন, বুদ্ধ এবং বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনে এই মত খণ্ডনের চেষ্টা করা হইয়াছে।

জৈন দর্শন।

জৈন দর্শন অনুসারে পারমার্থিক সত্য দুই শ্রেণীর সত্তায় বিভক্ত যথা—জীব বা আত্মা এবং অজীব বা জড়। জড় সত্তা সকল, ক্ষিতি, অপ, তেজ এবং মরুৎ এই চার শ্রেণীর পরমাণু এবং দেশ, কাল, আকাশ ও ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম। ধর্ম্ম অধর্ম্ম শব্দ দ্বারা তাহারা স্থিতি এবং গতি লক্ষ্য করিয়া থাকেন, অর্থাৎ যাহা আছে বলিয়া বস্তুর গতি এবং স্থিতি সম্ভব হয় তাহা।

মনুষ্যের আত্মাই হউক বা অন্য যে কোনও জীবের বা উদ্ভিদের আত্মাই হউক সকলেরই উন্নত হইতে উন্নততর অবস্থা লাভ করিবার যোগ্যতা আছে। ইহা দেহব্যাপী অর্থাৎ দেহ যত বড় তত বড়। উন্নততম অবস্থায় ইহার সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ করিবারও যোগ্যতা আছে। মুক্ত আত্মার ঐ অবস্থা লাভ হয়—এবং তখন তাহারা তীর্থঙ্কর হয়। জৈনদিগের মতে ২৪ জন তীর্থঙ্কর হইয়াছেন। প্রথম রিসভ দেব, এবং শেষ বর্দ্ধমান। বর্দ্ধমান, মহাবীর নামেও পরিচিত। কেহ কেহ মনে করেন যে তিনি বুদ্ধ দেবের সমসাময়িক ছিলেন।

বিষয় বাসনা বা রাগদ্বেষই বন্ধনের কারণ। এই সকল জড় দেহের উপাদান আকর্ষণ করে এবং জীবের জন্য অদৃষ্টের সৃষ্টি

করে। এই অদৃষ্ট কর্ম্মফল ভোগের জন্যই জীবের পুনঃ পুনঃ জন্ম হয় ও দুঃখ ভোগ করিতে হয়।

অজ্ঞতা হইতেই রাগদ্বেষের সৃষ্টি সুতরাং জ্ঞানই মুক্তির কারণ। সম্যক জ্ঞান, সম্যক দর্শন এবং সম্যক চরিত্র অভ্যাস করিলেই মিথ্যাজ্ঞান দূর হয়। তীর্থঙ্করদিগের উপদেশ সম্যকরূপে অধিগত হওয়াই সম্যক জ্ঞান। তাঁহাদিগের উপদেশে সম্যক বিশ্বাসই সম্যক দর্শন। সম্যক জ্ঞান অনুসারে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করাই সম্যক চরিত। জৈন দর্শনের ভাষায় এই তিনটিকে ত্রিরত্ন বলে।

অহিংসা, সত্যম্, অস্তেয়ম্, ব্রহ্মচর্য্যম্ এবং অপরিগ্রহম্ এই পাঁচটি পঞ্চব্রত। পূর্ণত্ব বা মুক্তিলাভ করিয়া তীর্থঙ্করত্ব লাভ করিতে হইলে পঞ্চব্রত পালন এবং ত্রিরত্নের অভ্যাস অপরিহার্য্য।

জৈন ধর্ম্মে ঈশ্বরের স্থান নাই। তীর্থঙ্কর বা মুক্তআত্মা হওয়াই জীবের উচ্চতম অবস্থা এবং এই অবস্থা পুরুষকার সাপেক্ষ। পঞ্চব্রত পালন এবং ত্রিরত্নে অধিগত হওয়াই ইহার উপায়। এই জন্যই তীর্থঙ্করদিগকে বলা হয় জিন, অর্থাৎ জয়ী এবং ধর্ম্মের নাম জৈন ধর্ম্ম।

জৈনদিগের মধ্যে দুই সম্প্রদায় আছে। দিগম্বর এবং শ্বেতাম্বর।

বৌদ্ধ দর্শন।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা গৌতম বুদ্ধ। তিনি দেখিতে পাইলেন যে, জগৎটা দুঃখ পূর্ণ। জরা ব্যাধি মৃত্যু প্রভৃতির ভয় ও উদ্বেগের কারণ হইতে ধনী কি নির্দ্ধনী কেহই মুক্ত নহে। এই দুঃখের হাত হইতে রক্ষা পাইবার কি কোনও উপায় আছে?

তিনি দেখিতে পাইলেন যে জগতে কিছুই নিত্য নহে, কিছুই অন্য অবস্থা নিরপেক্ষ নহে ; প্রত্যেক সত্তাই অন্য সত্তা সাপেক্ষ। জগৎ একটা ক্ষণভঙ্গুর কার্য্য কারণ প্রবাহ। প্রত্যেক কার্য্যের কারণ আছে। দুঃখও একটি কার্য্য। ইহারও কারণ থাকিবেই থাকিবে। এই কারণ নিরূপনের জন্যই তিনি সাধনায় দেহ মন নিয়োগ করিলেন, এবং কৃতকার্য্যও হইলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন, জন্মই দুঃখের কারণ, জন্ম নিরোধ করিতে পারিলেই দুঃখের হাত এড়াইতে পারা যায়। জন্মেরও ত কারণ আছে। তন্‌হা বা বিষয়ের প্রতি অনুরাগ বা বাসনাদ্বারাই আমাদিগের অদৃষ্টের সৃষ্টি হয় এবং এই অদৃষ্টানুযায়ী আমাদিগের জন্ম হয়। সুতরাং বাসনা নিবৃত্তিই জন্ম নিরোধের উপায়। বুদ্ধদেব নির্ব্বান লাভের পর বাসনাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন। হে গৃহ অর্থাৎ দেহ নির্ম্মাতা তোমাকে দেখিতে পাইয়াছি। তুমি আর আমার জন্য গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারিবে না। তোমার গৃহ নির্ম্মাণের সকল উপাদান ভগ্ন হইয়াছে।

বুদ্ধদেবের উপদেশ অনুসারে দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের ধ্বংস, দুঃখ ধ্বংসের উপায়, এই চারিটি বিষয়ের জ্ঞান চতুরার্য্য সত্য। জরা, ব্যাধি, মৃত্যু প্রভৃতির ভয়ই দুঃখ। জন্ম হইলেই এই সকল অনিবার্য্য। জন্ম নিরোধ করিতে পারিলেই দুঃখ নিবৃত্তি হয়। বিষয় বাসনা হইতেই জন্ম সুতরাং ইহার মূল বিনাশ বা বৈরাগ্যই দুঃখের ধ্বংস। যে অবস্থা লাভ করিতে পারিলে বাসনার মূল বিনাশ হয়, তাহাই নির্ব্বান বা নিঃশ্রেয়স। নির্ব্বান লাভেচ্ছু ব্যক্তিকে যে প্রণালীর সাধনা দ্বারা লক্ষে পৌছিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহাকে অষ্টাঙ্গ সাধন মার্গ বলে। এই অষ্টাঙ্গের নাম, সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সঙ্কল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম্ম, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি এবং সম্যক সমাধি।

সারকে সার অসারকে অসার বলিয়া জানাই সম্যক দৃষ্টি অর্থাৎ তত্ত্ব জ্ঞানই সম্যক দৃষ্টি। সম্যক দৃষ্টির অনুযায়ী কর্ম্ম করিবার সঙ্কল্পই সম্যক সঙ্কল্প। সম্যক দৃষ্টির অনুযায়ী বাক্য ব্যবহার এবং কর্ম্ম করাই সম্যক বাক্য এবং কর্ম্ম এবং তদনুযায়ী কর্ম্ম করিবার চেষ্টা এবং জীবন যাপনই যথাক্রমে সম্যক ব্যায়াম এবং সম্যক আজীব। সম্যক দৃষ্টি দ্বারা যাহা সত্য বলিয়া জানা যায় তাহা সর্ব্বদা স্মৃতি পথে রাখার নাম সম্যক স্মৃতি। এবং তাহার প্রতি চিত্তের একাগ্রতাই সম্যক সমাধি।

বুদ্ধদেবের শিক্ষা হইতে পরবর্ত্তী সময়ে, অনেক দার্শনিক মতের সৃষ্টি হয়। এই সকলের মধ্যে বৈভাসিক, সৌত্রান্তিক, যোগাচার এবং মাধ্যমিক, এই চারিটি মতই প্রধান।

বৈভাসিক এবং সৌত্রান্তিক এই উভয় মতেই বিজ্ঞান প্রবাহ-রূপ আমাদিগের আত্মা এবং কার্য্যকারণ প্রবাহরূপ এই বহির্জ্জগত সত্য। জগৎ মিথ্যা নহে; আমাদিগের আত্মা নিরপেক্ষ ভাবেও ইহার অস্তিত্ব আছে। উভয় মতই বাস্তব বাদী (Realistic)। পার্থক্য এই মাত্র যে বৈভাসিক মতে বাহিরের জগতের অস্তিত্ব আমাদিগের প্রত্যক্ষের বিষয়, সৌত্রান্তিক মতে ইহা আমাদিগের অনুমানের বিষয়। এই জন্য বৈভাসিক মতের অপর এক নাম বাহ্য প্রত্যক্ষবাদ এবং সৌত্রান্তিক মতের অপর এক নাম বাহ্যানুমেয়বাদ।

যোগাচারীরা বিষয়ি বিজ্ঞানবাদী (Subjectivist)। তাঁহা-দিগের মতে বিজ্ঞান প্রবাহরূপ আমাদিগের আত্মার বাহিরে কোনও জগৎ নাই। আত্মা নিরপেক্ষভাবে জগৎ বলিয়া কোনও সত্তা নাই। যখন একটি আত্মাও থাকিবে না তখন জগতও থাকিবে না। যোগাচারীরা কতকটা পাশ্চাত্য দর্শনে যাহাদিগকে চরম বিষয়ি বিজ্ঞান বাদী বা (Solipsists) বলে, তাহাদিগের ন্যায়।

পার্থক্য এই যে Solipsists দিগের মতে আত্মা পারমার্থিক স্থির সত্তা (Noumenal self); যোগাচারীদিগের মতে ইহা একটা বিজ্ঞান প্রবাহ (Emperical or phenomenal self) মাত্র। জাগ্রত ও স্বপ্ন অবস্থায় যে আত্মা থাকে ইহাকে বলে প্রবৃত্তি বিজ্ঞান এবং সুসুপ্তিকালে যে আত্মা থাকে তাহা আলয় বিজ্ঞান।

মাধ্যমিক দার্শনিকদিগের মতে আমাদিগের মনের বাহিরে বা ভিতরে, কোথাও কোনও নিত্য বস্তু নাই। এই দৃশ্যমান জগৎ একটা ক্ষণস্থায়ী কার্য্যকারণ প্রবাহ। ভিতরেও আত্মা বলিয়া কোনও স্থায়ী সত্তা নাই। যাহাকে আত্মা বলি ইহা একটা ক্ষণ বিজ্ঞান প্রবাহ ব্যতীত আর কিছু নহে? সকলেরই অস্তিত্ব ক্ষণিক। ইহাদিগের পশ্চাতে যাহা স্থায়ী তাহা এক অগাধ শূন্য। শূন্য হইতেই জগৎ প্রবাহের উৎপত্তি, শূন্যেতেই স্থিতি এবং শূন্যেই লয়।

শূন্য কথাটির দুই প্রকার ব্যাখ্যা হইতে এই মতেরও দুই প্রকার ব্যাখ্যা হইয়া থাকে। কেহ কেহ মনে করেন শূন্য অর্থ কিছু না—ফাকা স্থান। অসৎ হইতেই সৃষ্টি, অসতেই লয়। এই জন্য এই মতের আর এক নাম শূন্যবাদ বা সর্ব্ববৈনাশিক বাদ। ইহার ইংরেজী কথা (Nihilism.)

কাহারও কাহারও মতে মাধ্যমিক মতের প্রতিষ্ঠাতা কিছু না এই অর্থে শূন্য শব্দ ব্যবহার করেন নাই। তাহার মতে শূন্যের অর্থ এক নির্ব্বিশেষ সত্তা যাহাতে কোনও গুণের আরোপ করা যায় না। ইহা অবাঙ্মানসগোচর, জ্ঞাতব্য কিন্তু বক্তব্য নহে। নির্ব্বান লাভ হইলে ইহার সাক্ষাৎ অনুভূতি হয়। এই অর্থে শূন্য এবং অদ্বৈত বেদান্তের নির্ব্বিশেষ নির্গুণ ব্রহ্ম একার্থ বোধক। এই অর্থে শূন্য-বাদ ও অদ্বৈত বেদান্ত বাদের মধ্যে যাহা পার্থক্য তাহা ভাষাগত পার্থক্য মাত্র, ভাবগত নহে। সেই জন্য কেহ কেহ মনে করেন যে,

শঙ্কর অথবা তাহার গুরুর গুরু গৌরপাদ, শূন্যবাদ হইতেই অদ্বৈত বেদান্ত বাদের ইঙ্গিত পাইয়াছিলেন। সেই জন্য তাঁহারা শাঙ্কর মতকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মতও বলিয়া থাকেন। অবশ্য অদ্বৈত বাদীরা যে এই কথা স্বীকার করেন তাহা নহে।

মোটের উপর এই বলা যাইতে পারে যে চার্ব্বাক এবং পূর্ব্ব মীমাংসকগণ ব্যতীত আর সকল ভারতীয় দার্শনিকই দুঃখবাদী। জন্ম হইলেই দুঃখের হাতে পড়িতে হয়, সুতরাং বাসনা নির্মূল করিয়া জন্মনিরোধ করিতে পারিলেই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় এবং এই অবস্থা লাভই পুরুষার্থ। চার্ব্বাকগণ সুখবাদী। পূর্ব্ব মীমাংসকগণের মতে বৈদিক যাগযজ্ঞ বিধিপূর্ব্বক সম্পাদন করিয়া, ইহলোকেই হউক বা পরলোকেই হউক অভ্যুদয় লাভই পুরুষার্থ। ইহাও সুখবাদই।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭	২৩	দার্শনিকগণ	দার্শনিক
৮	১০	phonomenon	phenomenon
৯	৮	এমন	এমন কি
১০	১৯	কার্য্যত্বম্	কারণত্বম্
২১	২২	বিভাগকারী ব্যাখ্যাকারগণ	বিভাগকারী
২১	২৩	তাঁহাদিগের	ব্যাখ্যাকারগণের
৩০	৪ (এবং অন্যান্য স্থলে)	সামান্যত	সামান্যতো
৫৯	১১	আমার	আমরা
৬০	২৬	পারে	পারে।
৬৪	১২	magor	major
৭২	১৫	মূর্ত্তত্ব	অমূর্ত্তত্ব
৮৭	২	ব্যোমনস্থ	ব্যোমনৎসো
৮৭	২৬	সর্ব্বেভ্যঃ সমেতেভ্যো	সমেতেভ্যো দ্রব্যেভ্যো

গ্রন্থকার প্রণীত ধর্ম্মযোগ, দর্শন-সোপান বেদান্ত-সোপান, Introduction to the study of the Bhagabat Geeta, প্রভৃতি অন্যান্য গ্রন্থ, Modern Review, Prabudhabharat ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে উচ্চ রকমে প্রশংসিত হইয়াছে।

* * * *

"ধর্ম্মযোগ" সম্বন্ধে হরিদ্বার আশ্রমের শ্রীমৎ ভোলানন্দ গিরি মহারাজ লিখিয়াছেন:—"ইহাতে উচ্চ অঙ্গের ধর্ম্মের জটিল তত্ত্ব সকল অতি সরল ভাষায় সহজবোধ্য করা হইয়াছে। ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তি মাত্রই গ্রন্থখানা পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন।" বেনারস সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ, এম. এ. মহোদয় লিখিয়াছেন:—"ধর্ম্ম জীবনের মূলতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া চরম সাফল্য পর্য্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে যুক্তিপূর্ণ, অনুভবসিদ্ধ ও শাস্ত্রানুমোদিত প্রণালী অবলম্বনপূর্ব্বক আর কেহ এমন ভাবে আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না"।

* * * *

"দর্শন-সোপান" সম্বন্ধে দর্শনশাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, M. A. PHD., ডক্টর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সরকার, M. A. PHD., ডক্টর শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, M. A. PHD., ডক্টর শ্রীসুশীলচন্দ্র মিত্র, M. A. PHD., D. LIT., শ্রীযুক্ত বনমালী বেদান্ততীর্থ বিদ্যারত্ন, M. A., শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দত্ত, M. A., শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় M. A. ও শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার বসু, M. A. লিখিয়াছেন যে ইহা একখানা অভিনব গ্রন্থ। General Philosophy বিষয়ে বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত প্রথম গ্রন্থ। B. A. পরীক্ষায় যাহাদের 'General philosophy' optional subject, তাহারা এই গ্রন্থখানা পড়িলে অনায়াসে পরীক্ষার প্রশ্ন সকলের উত্তর দিতে পারিবেন।